তৃষ্ণা

তৃষ্ণা

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাকলি

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সিংহ
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
গৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা ৫

প্রচ্ছদ :
এস্. স্কোয়ার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

পরিবেশক :
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

প্রিয়বর,

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

অনুজপ্রতিমেষু

কথাকলির অন্যান্য বই :

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

তারার আঁধার ৩।।০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

কস্তুরীমৃগ ৪৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৈশালীর দিন ৩।০

বারীন্দ্রনাথ দাশের

দুলারীবাঈ ৪৲

বিমল করের

মল্লিক ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর

উত্তরলিপি ৪৲

সন্তোষকুমার দে-র

রক্তগোলাপ ৩৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

শ্রীমতী ৪৲

শৈলেশ দে-র

মিষ্টার এণ্ড মিসেস চৌধুরী ২।।০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

জতুগৃহ ৬৸০

সুবোধ ঘোষের

কান্তিধারা ৩৲

শক্তিপদ রাজগুরুর

কাঁচ-কাঞ্চন (যন্ত্রস্থ)

লেখকের অন্যান্য বই :

চন্দন-যাত্রা

সুন্দরী কথা-সাগর

কেয়াফুল (যন্ত্রস্থ)
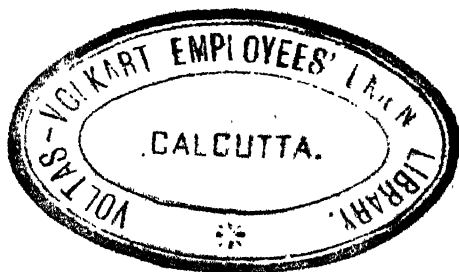
এক

"হে বসুন্ধরা, তুমি আমার অতি-অতিবৃদ্ধা পিতামহী, তবু তুমি অনন্ত-যৌবনা। তাই স্থিরযৌবনা তুমি। যৌবনই তোমার স্ব-ভাব, যৌবনেই তোমার স্ফূর্তি। তাই গাছে গাছে কচি পাতার দুর্বার অট্ট কলহাস্য; পুষ্পদলে অজস্র বর্ণাঢ্যতা; তাই আকাশ আজও ঘন সুনীল, মৃত্তিকার শ্যাম শোভা এত গাঢ়! হে অতিবৃদ্ধা, অনন্তনবীনা, তোমাকে নমস্কার।

রজস্বলা বসুন্ধরা সৌরমণ্ডলের মধ্যে আপন কক্ষপথে দয়িত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর তেজ থেকে নবপ্রাণ সৃষ্টির শক্তি সংগ্রহ করছেন আপন কুক্ষিতে। তাই এই আদিঅন্তহীন মিথুন-লীলা; তাই নারীর চোখে এমন চকিত বিদ্যুৎ, পুরুষের বাহুতে এত শক্তি, বুকে এত দুর্জয় সাহস।"

ডেভিড রোজারিওকে প্রথম দিন দেখে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল।

তার আগের দিন জেলে গিয়েছি। গিয়েছি মানে যেতে হয়েছিল! আমি সামান্য নিরীহ একজন মসীজীবী মানুষ। বিদেশী সরকার দগ্ধ-গৃহ গোধনের রক্তিম মেঘদর্শনের মত উনিশ-বিয়াল্লিশের আন্দোলনের বোমা-পিস্তলের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ভেবে সমাদর প্রদর্শনের জন্যই নিয়ে গিয়েছিলেন। সমাদর করেই নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত রক্ষা আইনের সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে।

প্রথম শ্রেণীর বন্দী! সম্মান-সমাদরের কোন ত্রুটি নেই। তার উপর জেলার শিক্ষিত রসিক মানুষ। তাঁর কাছ থেকেও সসম্মান প্রীতি ও আন্তরিকতা পেতে বিলম্ব হয় নি।

তবু মনটা উদাস হয়েছিল। অতি দ্রুত অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থান্তরে মন নিশ্চয় স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। তার উপরে অবস্থান্তরের ফলে আকস্মিক বন্দীদশা। মনের দোষ কি, মনের তো উদাস হবার কথাই। আগের রাত্রে এসেছি। প্রাতঃকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব

বললে—ভাগ শালা! জেনানার কথা ভেবে ভেবেই তোর মগজ খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু রসিকপ্রবর তাতে দমল না। সে হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠল। তার উচ্চ হাসির আকস্মিকতায় ক-টা চড়াই আর শালিক পোকা-মাকড় খুঁজে খেতে খেতে সচকিত হয়ে উড়ে চলে গেল।

তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে চীৎকার করে যেন বিশ্বসংসারকে শুনিয়ে বললে—আউর হ্যায় কিয়া দুনিয়ামে? উয়ো ছোড়কে fun কা ঔর কুছ হ্যায় নহি।

বলে আবার সেই হা হা হাসি!

মানুষটির কথাগুলি যেন এক সবল প্রত্যয়ের মত আমার কানে এসে বাজল, তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—অনন্তযৌবনা বসুন্ধরা নিজের যৌবনকে অক্ষয় রাখবার উদ্দেশ্যেই যেন বার বার সূর্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। আর সেই কারণেই মিথুন-লীলাতেই তাঁর পরম স্ফূর্তি, শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

এইবার মানুষটিকে ভাল করে দেখলাম।

প্রবীণ বয়স্ক মানুষ নয়। স্বাস্থ্যবান তরুণ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ! যে বয়সে এই মন আর এই কথা মানুষকে মানায় সেই বয়স ওর। তার চোখের অশালীন ভঙ্গি আমার কাছে কটু কুৎসিত লেগেছিল। কিন্তু চেহারা এবং বয়স দেখে সবটুকু ভাল লাগল।

পাতলা ছিপছিপে শক্ত বেতের মত চেহারা, অথচ সর্বাঙ্গে কচি লাউডগার মত সতেজ সরস একটি লাবণ্য পরিব্যাপ্ত। সে ঘুরতে ফিরতে আমার বেশ কাছে এসে পড়েছে বলে তাকে বেশ ভাল করে দেখতে পাচ্ছি। টিকালো ছোট্ট নাকটি, চোখ দুটি ছোট কিন্তু টানা-টানা। কপালটিও ছোট। মাথার ছোট চুলগুলি একটু লম্বা হয়েছে। সেই চুল কপালের উপর পড়েছিল। সে দু হাত দিয়ে যেন কত লীলাভরে তাকে উলটে আবার মাথার উপর তুলে দিলে। আমি জানি ওর অবাধ্য চঞ্চল মনের মত ওর চুলগুলি এখনই ওর দুই হাতের শাসন উপেক্ষা করে আবার ওর মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবচেয়ে সুন্দর ওর পাতলা ঠোঁট দুটি। সেখানে এখনও এক টুকরো অবাধ্য হাসি কৃষ্ণপক্ষের অস্তাচললগ্ন চাঁদের মত অস্ফুটভাবে লেগে রয়েছে।

আমার মনে হল যেন ওর ঠোঁটের প্রান্তে লেগে-থাকা অস্ফুট অবাধ্য

হাসিটিই ওর আসল স্বধর্ম। দ্বিধাহীন দুঃসাহসী কৌতুক যৌবনের লক্ষণ, আর ও যেন তারই মূর্তিমান বিগ্রহ।

এই সময় আমার সঙ্গে অকস্মাৎ ওর চোখাচোখি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ওর ধারা-ধরন একেবারে বদলে গেল! মুখে চোখে কৌতুকের জায়গায় সম্ভ্রম ফুটে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা কপালে তুলে বললে—মর্নিং স্যার!

আমিও হেসে বললাম—গুড মর্নিং!

আমি লক্ষ্য করলাম ওর মুখে সেই অস্ফুট হাসি কিন্তু ঠিক খেলা করছে।

আমি মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলার—কি নাম তোমার?

সে সসম্ভ্রমে উত্তর দিল—ডেভিড রোজারিও।

বলে সে কিন্তু আর সেখানে দাঁড়াল না। অত্যন্ত দ্রুত, সন্তর্পিত পদক্ষেপে সরে চলে গেল নিজের কাজের মধ্যে।

আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। ডেভিড রোজারিও?

ও তাহলে গোয়ানীজ ক্রিশ্চান! কিন্তু বিদেশী ক্রিশ্চানদের রূপে অমিত শক্তির সঙ্গে যে রূপের রুক্ষতা লক্ষ্য করি, যার ছায়া ওর মধ্যেও স্বপ্রকাশ, সেই ভার এবং রুক্ষতা কোনটাই তো ওর চেহারায় নেই! একটু আশ্চর্য লাগল। ওর চেহারায় বাঙলা দেশের শ্যাম শস্পের লাবণ্য, বাঙলার কোমল মৃত্তিকায় মানুষের চেহারা যে নরম, পাতলা, হালকা ছাঁদ নিয়েছে, সেই হালকা ছাঁদের ছাপ ওর কাঠামোর সর্ব অবয়বে।

লক্ষ্য করলাম, কপির ক্ষেতে ও আবার গিয়ে আপনার কাজে মন দিয়েছে।

আমি আবার আমার ঘরের ভিতর ফিরে এলাম।

ওর সঙ্গে কিন্তু আমার আবার যোগাযোগ হল। ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ।

জেলার ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই দিনেই একদফা বিশুদ্ধ সাহিত্য আলোচনা সাঙ্গ করে উঠছি এমন সময় তিনি বললেন—আপনি তো আপনার কাজকর্ম করাবার জন্যে একজন কয়েদি পাবেন। আমি দেখেশুনে একজন অ্যালট করে দি?

আমার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড রোজারিওর কথা মনে পড়ে গেল।

আমি বললাম—আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আপনি অনুমতি দিলে আমি একজনের নাম করব।

—বলুন না! আমার তরফ থেকে কোন অসুবিধা না থাকলে দেব। বাধা কি?

আমি সাগ্রহে বললাম—তা হলে ফালতু হিসেবে আমাকে আপনার ঐ ডেভিড রোজারিওকে দিন না। ঐ যে কপির ক্ষেতে কাজ করছে!

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে হাসলেন, বললেন—ওকে আপনি এর মধ্যেই চিনলেন কি করে?

বললাম তাঁকে সব কথা।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—হ্যাঁ, ছোঁড়া একটু ফাজিল কিন্তু বড় লাইভলি। তা নিন, ওকে নিন আপনি!

আমাকে সম্মতি দিয়ে গলা তুলে ডাকলেন—দরওয়াজা!

দরওয়াজা এসে দাঁড়াল স্যালুট করে!

উনি বলিলেন—এই, একবার ডেভিডকে ডাক তো!

কিছুক্ষণ পরে দরওয়াজার সঙ্গে ডেভিড এসে জেলার সায়েবের অফিসে দাঁড়াল।

তার মুখের দিকে তাকালাম। গোটা গায়ে ভিজে ধুলো লেগে আছে, যত্রতত্র ক্লেশে ও শ্রমে মুখখানা ঘামে সিক্ত। জেলার সাহেব ডেকেছেন শুনে ভয়ে ভয়েই এসেছে। তার উপর আমাকে জেলার সাহেবের সঙ্গে দেখে তার ভীত মুখখানা বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেল। সে নিজের মনে মনে দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার করে নিয়েছে। তার মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে ভরসাহীন দৃষ্টি ধরে নিয়েছে আমি তার নামে নিশ্চয় কোন অভিযোগ করেছি।

এই ঘামে-ভেজা, ধুলি-ধূসর, পাংশুমুখ তরুণকে দেখে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। আমার ছোট ভাইটাকে বাইরে রেখে এসেছি, তারও এমনি বয়স, সেও এমনি দুঃসাহসী! কি একটা সদয় কিছু বলবার জন্যে উদ্যত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমি নিজেও একজন বন্দী, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এখানে এই সহৃদয় ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করছেন এই পর্যন্ত! কথা বলতে গিয়েও তাই থেমে গেলাম।

জেলার সাহেব তার বিনীত নমস্কার অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেরত দিলেন। দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন—ক্ষেতে কাজ করিস, না ইয়ার্কি দিস?

সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একবার তাঁর মুখের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে—না হুজুর!

—না হুজুর? আমি বুঝি কিছু জানিনা ভাবিস? ক্ষেতের কাজে কেবল ফাঁকি দিস আজকাল। রাগত ভাবে বললেন জেলার সাহেব। তারপর বললেন—তোর ডিউটি আজ থেকে বদল করে দিলাম। তুই এই নতুন বাবুর ফালতু হয়ে কাজ করবি।

গম্ভীরভাবে তিরস্কারের সুরে জেলার যে শাস্তিবিধান করলেন সেটা যে তিরস্কার বা শাস্তি নয়, আসলে পুরস্কার—তা এক মুহূর্তে জেল-ঘুঘু ডেভিড রোজারিও বুঝে নিয়েছে। তার চোখে এক মুহূর্তে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটে উঠল। ঠোঁটে অস্ফুট হাসির আভাসও যেন দেখা দিল! কিন্তু পাছে এই হাসি কোন ঔদ্ধত্যের ইঙ্গিত দেয় সেইজন্যে সেই হাসি অস্ফুটই থাকল। সে শুধুমাত্র স্যালুট করে সসম্ভ্রমে বললে—জী!

জেলার সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন—যা, হাত-পা ধুয়ে বাবুর ঘরে চলে যা!

আবার স্যালুট, তারপর প্রস্থান।

সে চলে যাবা মাত্র ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। বললেন—দেখলেন তো, কেমন কাজ আমাদের। কেমন অভিনয় করতে পারি তা বলুন!

আমিও হাসলাম, বললাম—ভালোই। আচ্ছা মিঃ সরকার, ডেভিডের মেয়াদ কত দিনের?

—সাত বছর বোধহয়! বছর দুয়েক মাত্র হল তার মধ্যে।

অকস্মাৎ কথার পিঠে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—ওর কন্‌ভিকশন কেন হয়েছে? কি করেছিল ও!

মিঃ সরকার এক মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখটাও তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। যেন তাঁর মুখে তালা-চাবি পড়ে গেল।

বুঝলাম প্রশ্নটা সঙ্গত হয়নি এবং আমার কৌতূহল ও অধিকার আপনার সীমা লঙ্ঘন করেছে! সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলাম, এ প্রশ্নটা ডেভিডকেও করা চলে না! আমিও সব বুঝে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেলাম।

আমার মনে হল মিঃ সরকার যেন অনুভব করেছেন যে একদিনের পক্ষে আমার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা যথেষ্ট দূরের চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আর তিনি যেন অকস্মাৎ আপনার মধ্যে গুটিয়ে গেলেন! শুকনো খটখটে ভদ্র গলায় বললেন—আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জী, আমি এখন একটু কাজ করি। গোটা দুয়েক জরুরী রিপোর্ট আছে লিখতে। আপনিও ইতিমধ্যে আপনার ঘর-টর গুছিয়ে নিন। কতদিন থাকতে হবে তার তো কোন স্থিরতা নেই। কাজেই দেখেশুনে নেওয়াই ভাল।

আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লাম। নিজেকে কেমন অকারণে ছোট মনে হতে লাগল। বললাম—ভালই বলেছেন মিঃ সরকার! একটু গেরস্থালী করি গিয়ে।

তাঁর ঘর হতে বের হতে হতে অনুভব করলাম—এটা জেলখানাই। এখানকার প্রাপ্য সমাদরের চেয়ে বেশী কিছু পাবার প্রত্যাশা করা উচিত হবে না!

মনটা ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। ক্লিষ্ট মনেই এসে নিজের ঘরে উঠলাম।

উঠতেই দেখি ডেভিড হাসিমুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

এর মধ্যেই ও মুখ হাত ধুয়েছে, গায়ের পায়ের ধুলো ঝেড়েছে, তারপর আমারই জন্যে দাঁড়িয়ে আছে মুখে একমুখ হাসি নিয়ে। যেন নব গৃহ-প্রবেশের মুখে কোন পরমাত্মীয় মুখে হাসির প্রসন্নতা, হৃদয়ে স্নেহের ও সমাদরের উত্তাপ নিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তার চোখে চোখ পড়তেই সে কপালে ডান হাত ঠেকিয়ে বললে—মর্নিং স্যার!

হেসে বললাম—গুড মর্নিং ডেভিড!

ডেভিডের মুখের হাসি প্রসারিত হয়ে উঠল।

সেই হাসির উত্তাপে বোধহয় আমার অজানা অপরিচিত এই পরিবেশে মনটা অকস্মাৎ একটু অস্বাভাবিক রকম কোমল হয়ে উঠল, বললাম—
I just had to leave a younger brother like you at home.

বলে ফেলেই অনুভব করলাম ঠিক করলাম না। ও আর আমি দুজনেই বন্দী এ কথা ঠিক, কিন্তু জেলের বাইরে এবং ভিতরে সর্বত্র ওর আর আমার শ্রেণী পৃথক। ওর সঙ্গে এভাবে কথা না বললেই ভাল ছিল।

ফিরে তাকালাম ওর দিকে। আমার কথাগুলোর কি জাদু ছিল জানি না, কিন্তু ও নিজের দুই চোখ বিস্ফারিত করে নির্বাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকতে থাকতে ওর দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

আমি ব্যাপারটাকে লঘু করবার জন্যে বললাম—**What's wrong David ?**

সে ততক্ষণে চোখের জল মুছে নিয়েছে। সে আপনার আবেগটা চাপতে চাপতে সহজভাবেই বললে—**Nothing sir। But none of your station ever spoke to me like that.**

তারপর সে সুর পালটে বললে—**Now for our new life sir ! Let's start.**

বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল। তার মুখে আবার সেই সকালের হাসি ফুটে উঠেছে।

ডেভিড আমার কাছে থেকে গেল পরমানন্দে। সোনায় সোহাগার মত, এমন কি জলের সঙ্গে চিনির মত আমার সঙ্গে মিলে গেল ডেভিড। আমিও তাকে পেয়ে যেন বেঁচে গেলাম। শুধু তার সেবা নয়, তার সঙ্গ পেয়েও বেঁচে গেলাম। সে আমার টুকিটাকি সমস্ত কাজ আমি বলবার আগেই নিজে থেকে দেখেশুনে শেষ করে রাখে। আমাকে কিছুই বলতে হয় না। কখনও দেখি আমার খদ্দরের পাঞ্জাবি সাবান দিয়ে কেচে টান টান করে সে মেলে দিচ্ছে, কখনও ময়লা ন্যাকড়ার টুক্‌রো নিয়ে সে বসেছে জুতো পরিষ্কার করতে।

আমি হেসে বলি—অতো পরিষ্কার জুতো নিয়ে কি করব রে ডেভিড ?

সে জুতো মুছতে মুছতেই বলে—**The shoes should always be clean. A man is known by his shoes sir !** বলে সে হাসে।

আমি বলি—তা জুতোতে তুমি নাই বা হাত দিলে ! **I can do it myself.**

সে গম্ভীরভাবে বলে—**I don't mind it sir !**

ওর মুখে গাম্ভীর্য মানায় না একেবারে ! ওর মুখের গাম্ভীর্য দেখে আমার হাসি পায়। ওর মুখে যা মানায় তা হল সেই বেপরোয়া, দুঃসাহসী, সকৌতুক হাসি।

আমি দু-এক দিন এলোমেলো কাটিয়ে একটা ভারী বই লিখবার সংকল্প নিয়ে বসলাম। বই আর কাগজপত্র নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকি। বলা ভুল হল, ব্যস্ত রাখি নিজেকে কাজ নিয়ে।

আমার কাজের অবসরে ডেভিড আমার কাগজ বইপত্র সব যত্ন করে গুছিয়ে রাখে।

একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—**You are an author Sir !**

মুখে তার অপরিমেয় গাম্ভীর্য, অন্তহীন শ্রদ্ধা।

আমি হেসে বললাম—**Yes.**

সে গম্ভীরতর ভাবে বললে—**I thought so.**

আমি হাসতে লাগলাম।

আমার যখন কাজ থাকে, অথচ ওর কাজ থাকে না ও তখন মেঝের উপর চুপ করে বসে থাকে। কাজের ফাঁকে এক সময় দেখতে পাই চঞ্চল ছেলে শান্ত হয়ে বসে থাকলে যেমন এক সময় বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে সেও তেমনি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার কেমন মায়া লাগে।

আবার যখন আমারও কাজে থাকে না, সেও বসে থাকে, তখন গল্প করতে করতে এক সময় আমার পা'টা টেনে নিয়ে টিপতে আরম্ভ করে। প্রথম দিন সচকিত হয়ে উঠে পা টেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাধা দিতে পারিনি। সে জোর করে পা টেনে নিয়ে বলেছিল—**I know a little massaging, just see.**

আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম—মাসাজ করতে আবার শিখলে কখন ?

সে হেসে বললে—**I learnt it because I had to. My step-father made me learn it !**

ওর যে জীবনকে আমি জানি না, যা যবনিকার অন্তরালে বিরাজিত, অথচ যাকে জানার আমার একান্ত ইচ্ছা অথচ লৌকিক ভদ্রতার খাতিরে জানতে পারি না, অনুভব করলাম সেই যবনিকার একটা কোণ অকস্মাৎ সরে গিয়ে সামান্য একটু দেখতে পেলাম। কিন্তু আবার তা যবনিকায় আবৃত হয়ে গেল।

এর পর থেকে সে সময় সময় আমার পা নিয়ে বসে। টেপেও চমৎকার।

সে হেসে ইংরেজীতে যা বললে তার মর্মার্থ হল—ও যা শিখেছে

তা বাধ্য হয়েই শিখেছে এবং শিখবার জন্ত ওকে মূল্য দিতে হয়েছে যথেষ্ট! ও যখন তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে তখন ওর মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী যেদিন রাত্রিতে মাতাল হয়ে ফিরত সে দিন যতক্ষণ না ঘুমিয়ে তার নাক ডাকত ততক্ষণ তাকে তার হাত, পা, কোমর, পিঠ দলাই-মলাই করতে হত। তার কচি হাতে আর জোর কত! সে প্রাণপণে দু হাত দিয়ে দলাই-মলাই করেও প্রকাণ্ড জোয়ান মাতাল এণ্ড্রু গোমেজকে প্রসন্ন করতে পারত না। একটু খুঁত হলেই প্রকাণ্ড জলচর কুম্ভীরের মত খাটের উপর শয়ান এণ্ড্রু সাহেব সাপের মত এক মুহূর্তে পালট দিয়ে উঠে ওকে প্রচণ্ড প্রহারে নির্যাতিত করত! সে প্রথম প্রথম নিদারুণ কঠিন ভয়ে ও কঠিনতর যন্ত্রণায় চীৎকার করে কাঁদত। তখন ছুটে আসত ওর মা। ছুটে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ত ব্যাকুল হয়ে, বলত—কি করছ কি তুমি এণ্ড্রু? তুমি কি ভুলে গেছ যে ও তোমার মত জোয়ানও নয়, মাতাল নয়? ও তোমার বেহিসাবী মার সহ্য করবে কি করে? তখন গজগজ করতে করতে ছেড়ে দিত এণ্ড্রু। প্রহার থেকে নিরস্ত হত। কিন্তু তার পর কান ধরে টেনে এনে নিজেই তার কচি হাত-পা আপনার ভারী মোটা আঙুল দিয়ে টিপে টিপে তাকে কেমন করে মাসাজ করতে হয় শেখাত। সে এক হাতে চোখের জল মুছত, অন্ত হাতে টিপত এণ্ড্রু সাহেবের নির্দেশমত। সব বলে ম্লান হাসি হেসে বলেছিল—যা শিখেছি তা অনেক দাম দিয়ে শিখেছি। কাজেই ভুলি কি করে?

আমিও দুঃখের হাসি হাসতাম। সেদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা ডেভিড, তুমি বাংলা জান না?

ডেভিড মাথা হেঁট করলে, আস্তে আস্তে বললে—জানি। তবে ভাল জানি না।

—তবে বল না কেন?

—বলতে কেমন কেমন লাগে! ভাল জানি না তো!

—এই তো বেশ বলছ! তার ওপর তোমার চেহারাও কেমন বাঙালীর মত। তোমার নাম ডেভিড বলে না জানলে আমি তো তোমাকে বাঙালীই মনে করতাম।

ডেভিড অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন জোর করে বলে ফেললে—**My grandma was a Bengali.**

কথাটা যেন আমি তার মুখ থেকে জোর করে বের করে নিয়েছি। সে যেন অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্যেই আমাকে প্রশ্ন করলে—But what are you writing on? What's the subject?

আমি হেসে বললাম—বললে তুমি বুঝতে পারবে? I am writing a book on Sanskrit Drama.

সে বুঝবার চেষ্টা করতে করতে বললে—Sanskrit Drama?

আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললাম—Yes. Have you heard the name of Kalidasa?

কাকে কি বলছি খেয়াল করিনি। খেয়াল থাকলে মোটর মেকানিক ডেভিড রোজারিওকে নিশ্চয় কালিদাসের নাম শোনাতাম না!

সে কিন্তু বুঝল। বললে—Yes, yes. I remember.

বলে সে ভাবতে লাগল। নিজের মনের কোন বিস্মৃত প্রদেশের স্মৃতির সন্ধানে সে নিজের মনের ভিতরটা যেন হাতড়াতে লাগল। কিছু একটা খুঁজে পেলেও যেন সে। অকস্মাৎ বললে—A beautiful girl married a king, a great king. That king gave her a ring as a souvenir, which she accidently lost. That ring was ultimately found from within the belley of a big fish…

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম—Yes, you remember it alright. That's his greatest drama Shakuntala.

পর মুহূর্তেই মোটর মেকানিক ডেভিডের শকুন্তলার গল্প স্মরণ করার ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকল। বললাম—but how could you know it? Then you had been to a school and had good education.

সে লজ্জিত হয়ে বললে—That's nothing, sir.

আমিও তাই ভাবলাম। ডেভিড শিক্ষা হয়তো কিছু পেয়েছিল, তবে তা নিশ্চয়ই তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়! মোটর মেকানিক ডেভিড যদি শিক্ষাই পেত তা হলে সে মোটর মেকানিকই বা হবে কেন, আর এই জেলখানাতেই বা আসবে কেন?

যাই হোক, ছেলেটা আসলে একান্ত ছেলেমানুষ এবং হাসিখুশি স্বভাবের। তার উপর আমার অত্যন্ত ন্যাওটা হয়ে পড়েছে।

আমার কাজকর্ম করে, অবসর সময়ে আমার চেয়ারের পাশে মেঝের

উপর বসে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। কখনও কখনও সামান্য সামান্য জিনিস নিয়ে মেতে থাকে।

কদিন তো আমার থেকে খানিকটা কাগজ আর একটা লাল পেন্সিল চেয়ে নিয়ে তাই নিয়ে মশগুল হয়ে থাকল। কাজের সময় ডেকে তার সাড়া পাই না। অন্য সময় একটা ডাক ডাকলেই সে ছুটে আসে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে সে যে কি করলে সেই জানে! কদিন পরে আমাকে আবার পেন্সিলটি ফিরিয়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল, পেন্সিলের কাজ হয়ে গেল?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ!

—কি করলে পেন্সিল নিয়ে? কাগজ সব খরচ হয়ে গিয়েছে বুঝি? তা কি লিখলে?

সে মুখ নামিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

বললাম—খুব লিখলে তো? আমার চেয়েও তাড়াতাড়ি লিখেছ? যা দেখছি তুমি বই লিখলে আমার চেয়েও তাড়াতাড়ি লিখতে পারবে।

সে হাসতে হাসতে চলে গেল!

আবার কদিন পর একটা নূতন খেলা নিয়ে সে মেতে উঠল।

ফুলখড়ির গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজা আমার বহুদিনের অভ্যাস। এই শ্রীভবনে আসবার সময় বাড়ি থেকে এই অতি তুচ্ছ অথচ আমার অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে এনেছিলাম। ফুরিয়ে যেতে জেলার মিঃ সরকারের দ্বারস্থ হলাম। সবিনয়ে তাঁকে বললাম—আমার একটি জিনিস চাই মিঃ সরকার।

—কি বলুন।

—খানিকটা ফুলখড়ি!

মিঃ সরকার সকৌতুক বিস্ময়ে হেসে উঠলেন। বললেন—কি ব্যাপার? ফুলখড়ি কি করবেন মিঃ ব্যানার্জী? ছবি আঁকবেন নাকি লেখা ছেড়ে?

—না, আপনাদের দেখে যে দাঁত মেলে আনন্দ প্রকাশ করি সেই দাঁত মাজার জন্যে।

—তা দেব, অবশ্যই দেব!

সকালে বলেছিলাম, বিকেলে একতাল ফুলখড়ি এসে হাজির।

খড়ির তালটা দেখে ডেভিডের চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে উঠল। সোৎসাহে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—এত খড়ি নিয়ে কি করবেন স্যার? ছবি আঁকবেন?

—না। তুমি এক কাজ কর তো ডেভিড। খড়িটা গুঁড়ো কর। আমার টুথ পাউডার হবে।

ডেভিড সোৎসাহে কাজে লেগে গেল। কাজ শেষ করে খড়ি গুঁড়ো প্যাকেট করে আমার টেবিলের উপর সযত্নে রেখে দিয়ে একটা টুকরো হাতের মুঠো খুলে আমাকে দেখিয়ে যেন কোন মহামূল্যবান বস্তু প্রার্থনা করছে এমনিভাবে বললে—এটা আমি নেব স্যার?

আমি ওর ছেলেমানুষি খেয়াল জানি। হেসে বললাম—নিশ্চয়! তুমি আরও খানিকটা নিতে পারতে ইচ্ছা করলে। বলে নিজের কাজে মন দিলাম।

পরদিন একদফা লেখার কাজ সেরে মিঃ সরকারের সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছিলাম।

শরৎকাল এসেছে। রৌদ্রে সোনার রঙের আমেজ লেগেছে! মাথার উপরে আকাশের নীলিমা যেন কচি ছেলের মুখের হাসির মত প্রসন্ন।

বড় ভাল লাগল।

বেরুতে গিয়েই দেখলাম দরজার দিকে পিছন করে ঘাড় হেঁট করে ডেভিড একমনে কি যেন করছে।

আমি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর পিছনে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালাম।

দেখলাম আমার দেওয়া খড়ি নিয়ে ও অতি যত্নে আঁকছে।

ভাল করে দেখলাম।

ও এঁকেছে একখানি মুখ। একটি মেয়ের মুখ।

ও নিজের কাজের মধ্যে যেন হারিয়ে গিয়েছে।

বুঝলাম।

বুঝলাম এও সেই আদিঅন্তহীন মিথুন-লীলা। বুঝলাম বন্দীত্বের সন্ধ্যাসমাগমে এই কারা-প্রাচীররূপী নদীর এপার থেকে বিরহী চক্রবাক নদীর অপর তীরের চক্রবাক-বধূর জন্য বিধুর হয়ে উঠেছে।

নিজের পিছনে আমার অস্তিত্ব অনুভব করেই সে চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখখানি মুছে দিলে। একবার আমার দিকে তাকালে।

তার মুখ শবের মত বিবর্ণ। যেন সে কত অপরাধ করে আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে।

অকারণেই মনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করলাম।

কেন এমন হয়?

মানুষের জীবনে মিথুন-লীলা তো যেমন অন্তহীন তেমনি ছেদহীন! এ কালিদাসের কালেও ছিল, আজও আছে। কিন্তু ও কালের দুষ্মন্ত, চারুদত্ত, চন্দ্রাপীড়রা ভালবেসে এত ভয় পায় কেন? প্রেমের সেই অকুণ্ঠ বীর্য কোথায়? এ কালের শকুন্তলা, বসন্তসেনা, মহাশ্বেতারা কি প্রেমের জন্যে সেকালের মত বেদনা পায় না?

তাই যদি হবে ডেভিড ভালবেসে ভয় পায় কেন?

দুই

কেন এমন হয় ?

সমস্ত দিনটা ঐ একটা প্রশ্নই আমার মনে একটা ব্যথার মত ঘুরে বেড়াল। সেদিন আর ডেভিডকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

তারপরেও করলাম না! কারণ ভেবে দেখলাম ওকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা কোনক্রমে সঙ্গত হবে না। ওর প্রেমের গোপনতা, ওর ভয় ওরই থাকুক! আমার তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে লাভ কি ?

পরদিন সন্ধ্যায় ও যখন আমার পা টিপছে তখন প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে অন্য আকার নিয়ে বেরিয়ে এল। ওকে এমনি বললাম—তুমি তো বেশ ড্রইং জান ডেভিড ?

আমার ওপর সজোরে ও সোৎসাহে চলতি ওর হাত অকস্মাৎ আলগা হয়ে থমকে গেল। সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—আমি ড্রইং ভালই জানতাম স্যার! আমার টেস্টও ছিল, শিক্ষাও পেয়েছিলাম!

এইটুকু বলে থেমে গেল ডেভিড। আমার মনে হল যেন কথা শেষ করে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

আমি প্রশ্ন করলাম—তবে ?

প্রশ্নটা যে একান্ত অর্থহীন তা প্রশ্নটা করেই আমার মনে হল।

ডেভিড কিন্তু আমার অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দিলে। বললে—That's a long story, sir, moreover it's just memory now. Nothing more.

তারপর সেদিন সন্ধ্যাতেই নানান কথার মধ্য দিয়ে ওর ছবি আঁকার ও শেখার কথা খানিকটা জানতে পারলাম।

ওর বয়স তখন সাত কি আট। ওর এক জন্মদিনে ওর মা বার্থডে প্রেজেণ্ট হিসেবে ওকে একটি রঙ-পেন্সিলের বাক্স কিনে দিয়েছিল। দিয়েছিল ওরই একান্ত অনুরোধে। ছোট্ট ছেলের একটি ছোট্ট শখ হিসেবেই সবটা দেখেছিল ওর মা। কিন্তু পরের দিন বিকেল বেলা

ও অবাক করে দিয়েছিল ওর মাকে। ওর বাবা করত একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলে মাস্টারি, আর মা ছিল এক বিলেতী ফার্মে টাইপিস্ট।

ডেভিডের ছুটি হত সকাল সকাল। বেলা তিনটে নাগাদ ইস্কুলের ছুটি হয়ে যেতেই সে এসে বসে গিয়েছিল রঙ-পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে। মনে বিপুল উদগ্র ইচ্ছা! গোটা বিশ্বসংসারের তাবৎ বস্তুকে বিশেষের রূপে সে এঁকে ফেলতে চায়।

কাগজ-পেন্সিল নিয়ে সে প্রথমে আঁকলে চেয়ার, তারপর মায়ের খাটখানা। এঁকে তৃপ্তি হয় না। কি আঁকবে এবার?

—ম্যাও। মায়ের পোষা বেড়ালটা আদরের প্রত্যাশায় তার সামনে এসে বসল।

তার মনে হল যেন সাদা-কালো রঙের বেড়ালটা তাকে বলছে—আমাকে আঁক।

সে তার দিকে তাকিয়ে বললে—**You want I draw you?**

—ম্যাও।

—**You want it? Then I shall do. But you must sit quiet. Just wait.**

বলে সে উঠে চলে গেল। আলমারির ভিতর থেকে একটা পিরিচে খানিকটা দুধ ঢেলে এনে সে বেড়ালটার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—**Now drink and be quiet.**

বেড়াল দুধ খেতে লাগল, সেও রঙ-পেন্সিল তুলে নিলে।

কিন্তু এ কি? কাল পেন্সিলটা ক্ষয়ে গিয়েছে যে! কি হবে তা হলে? তাহলে এই সবুজ রঙেই সে আঁকবে। বেশ নিটোল লম্বা আছে পেন্সিলটা!

সে আঁকতে লাগল। দ্রুত এঁকে চলল। বেড়ালটা যেন পা গুটিয়ে আদর নেবার জন্য চোখ মিট মিট করে বসে আছে!

মা যে কখন খুটখুট করে এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে সে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলে যখন মা সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল—**M-y G-o-d! What have you done?**

সে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে বললে—**Yes!**

ছবির উপর ঝুঁকে পড়ে দেখে মা বললে—**Excellent! But you have made it green!**

সে গম্ভীরভাবে বললে—Yes, because it's a green cat.

—But cats are never green !

সে প্রতিবাদ করে বললে—But what's harm if I make it green ? It's a green cat.

আজ তার কথা শুনে আমি হাসলাম। অনুভব করলাম শিল্পকর্মের একটা মূলতত্ত্ব সেদিন একটা আট বছরের ছেলের অপাপবিদ্ধ দৃষ্টিতে ঠিক ধরা পড়েছিল। সে শিল্পী, সে প্রকৃতিকে অনুকরণ করবে কেন ?

মায়ের কথার শেষ জবাব দিয়ে সে বলেছিল—But it's a cat alright. Isn't it ?

বাবা আসতেই মা উল্লসিত হয়ে পুত্রের শিল্পকর্মের নিদর্শন ছবিখানা সোল্লাসে স্বামীর সামনে ধরলে—Just see Johnny, how our David has drawn our cat ! But he has made it green !

বাবা গম্ভীর মুখে সেখানা হাতে নিয়ে বললে—Yes, he has done it rather well. He has a knack for it.

বাবা শান্ত গম্ভীর মানুষ, কথা বলে কম, উচ্ছ্বাস অন্তরে যত গাঢ়ই হোক, মুখে তার প্রকাশ নাই। তার পক্ষে এইটুকু সাধুবাদই যথেষ্ট। মা বাবার কথা শুনে খুশিতে জ্বলে উঠল। সে বললে—He has the knack, hasn't he ? He may be a great artist some day.

বাবা শুধু হেসেছিল। মুখে কিছু বলে নি।

মায়ের বুকে একসঙ্গে অনেক আশা জ্বলে উঠেছিল মশালের মত, সে স্বামীর হাত ধরে বলেছিল—Why don't you arrange for his training ?

বাবা হেসে বলেছিল—Well, I shall try.

আমি গভীর কৌতূহলের সঙ্গে ওর কথা শুনছিলাম। কিন্তু এই সময় এই বন্দীশালায় নিজের নিজের শয্যায় গিয়ে স্থান গ্রহণের নির্দেশ-জ্ঞাপক ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম—যাও, শোও গিয়ে। আবার কাল শুনব।

সেও উঠল। যাবার আগে আমার দিকে একবার তাকালে শূন্য-দৃষ্টিতে। ছায়ান্ধকারের মধ্যেও লক্ষ্য করলাম ওর মুখে একটি অর্থহীন হাসি সুখস্বপ্নের স্মৃতির মত খেলা করছে।

তার পরদিনই শুধু নয়, তার পর দিনে দিনে ওর কথা টুকরো টুকরো করে শুনেছি ওর কাছ থেকে। ওর গল্প প্রতিদিন ও নিজেই বলতে আরম্ভ করে, তারপর এক সময় এক জায়গায় এসে আটকে যায়। আর মুখ খোলে না। মনে হয় নির্জন প্রভাতে গাছপালা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে একটি শামুক আপনার খোলের থেকে মুখ খুলে বের করে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করেছিল। কি যেন কোথায় বাধা কি ভয় কল্পনা করে অকস্মাৎ নিজের অতি কোমল দেহটা এক মুহূর্তে খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললে। তখন শত সাধ্যসাধনাতেও ও মুখ খুলবে না কিছুতেই। তবু ওরই মধ্যে ওর কথা, বিশেষ করে ওর বাল্যজীবনের কথা জেনেছিলাম।

আমার তোমার মতই আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের মানুষ। ভদ্র, সৎ, শিক্ষিত, নির্বিরোধ, আইনভীরু, ধর্মভীরু গৃহস্থ; নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে, কারও কোন ঝামেলায় থাকে না, নিজের সামান্য বৃত্তের মধ্যে যাদের সুখ, দুঃখ সবই।

তার মনের আর্ট গ্যালারীর বন্ধ দরজা ধীরে ধীরে সে খুলে ধরেছিল আমার কাছে। তার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর সে দরজা খোলা পেয়েছি ধীরে ধীরে।

সে ঘরে ঢুকবার অধিকার পেয়েই কি সব একদিনে দেখতে পেয়েছিলাম না দেখবার অধিকার মিলেছিল? সব ছবির উপরেই তার মনের গোপনতার কালো ভেলভেটের পর্দা টাঙানো ছিল। তবে আমার সঙ্গে পরিচয় যেমন যেমন গাঢ় হয়েছে, ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে তেমনি এক একখানি ছবির উপর থেকে গোপনতার পর্দা সরিয়ে সেই ছবিখানিকে পরম সমাদর করে আমার সামনে মেলে ধরেছে সে।

প্রথম যে মুখ দুখানি সে আমাকে দেখিয়েছিল সে মুখ প্রায় প্রতি মানুষের জীবনের পার্বতী-পরমেশ্বর-এর ছবি। তার বাবার আর মায়ের।

তার বাবা আর মা সঠিক সত্যরূপে কেমন ছিলেন তা আমার পক্ষে জানা দুঃসাধ্য। কারণ আসল ছবির গায়ে ছেলে তো দিনে দিনে মমতা, প্রেম, শ্রদ্ধার সোনায় রঙ লাগায় গাঢ় করে; আবার বিস্মৃতিতে সে রঙের খানিকটা খানিকটা ধুয়ে যায়। আবার সদা জাগ্রত মন তখন নিজের অবহেলা লক্ষ্য করে দ্বিগুণ নূতন সোনার রঙ ধরায় সে ছবিতে।

মনের সেই সোনার রঙ-ধরানো বাবা মায়ের ছবিই ডেভিড আমার কাছে মেলে ধরেছিল।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে দেখেছিল মায়ের তরুণ, স্নেহ-কোমল মুখ। তার থেকে আর একটু দূরে একটি পুরুষের শান্ত গম্ভীর প্রসন্ন মুখও সে দেখেছিল। সে মুখ তার বাবার।

এমন ভাবে তাঁদের ছবি দুখানি সে আমার কাছে মেলে ধরেছিল, স্মৃতির ও ব্যক্তিগত আবেগের এমন আলো সে ফেলেছিল সেই স্মৃতিতে যে তার মায়ের মুখে মধ্যযুগের মহৎ শিল্পীদের আঁকা ম্যাডোনার মুখের ছায়া দেখেছিলাম। আর তার বাবার মুখে দেখেছিলাম যিসাসের ছায়া। সে ছায়ার জ্যোতিতে তার বাবা-মাকে যতখানি বুঝেছিলাম তার চেয়ে বেশী বুঝেছিলাম ডেভিডের আপন চিত্তকে!

ছোট্ট তিনখানা ঘর দোতলার উপর। রয়েড স্ট্রীট থেকে একটু ভিতরে গলির মধ্যে। সেই ছোট্ট পরিবেশের মধ্যে বাবা আর মায়ের স্নেহে, সমাদরে ও শাসনে ও বড় হয়ে উঠেছিল। ওর ধারণা ছিল ও মস্ত বড় হয়ে গিয়েছে। ওর বয়স তখন পাঁচ বছর।

সেই সময় থেকে আরম্ভ হল ওর ইস্কুল। মা ভাল করে জামাকাপড় পরিয়ে স্কুলের ব্যাগটা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে টিফিনের কৌটোটি ভাল করে দেখে নিয়ে ওর ব্যাগে পুরে দিয়ে ওর দিকে সস্মিত মুখে একবার তাকিয়ে দেখে নিত।

ও দাঁড়াত গম্ভীর মুখে বীর জেনারেলের মত।

নিজের দুই হাত দিয়ে দুই কাঁধ ছুঁয়ে মা হাসিমুখে বলত—Now you look so f-i n-e!

তার পর ডাকত—Johnny, he is ready. Take him along.

গম্ভীর প্রসন্ন মুখে বাবা জন রোজারিও এসে তার হাত ধরত।

তারপর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার সময় থাকত না। বাবার হাত ধরে তরতর করে নেমে চলে যেত রাস্তায়। বাবার হাত ধরে ছোট ছোট পা লম্বা লম্বা করে ফেলে চলত ইস্কুলের দিকে।

এক-এক দিন উৎসাহের মুখে সে বাবাকে আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে ফেলত। রাস্তায় যেতে যেতে অকস্মাৎ চোখ বড় বড় করে হাত পা ছুড়ে বলত—Daddy, I shall be a hero like David. I shall kill the giant.

বাবা প্রথম দিনেই তাকে সংশোধন করে দিয়েছিল। শান্তভাবে বলেছিল—If you so like, you may try to kill the giant. But I won't like it much.

ডেভিড বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে, তদুপরি ব্যথিত হয়ে বলেছিল—কেন পছন্দ করবে না বাবা ?

—I don't like things like killing. ও সব আমি পছন্দ করি না। তা সে তুমি যাকেই মার না কেন।

—তা হলে ?

বাবা উত্তর না দিয়ে চুপ করে গেল।

ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তা হলে তুমি কি পছন্দ কর ?

বাবার শান্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হল—আমি চাই যে, আমার ছেলে দরিদ্রের বন্ধু হবে ; লর্ড যিসাস যেমন করে সকলের দুঃখ নিজে বহন করেছিলেন তুমি তেমনি করবে। নিজের দুঃখ অপরের দুঃখ দুইই।

সে সম্বৃত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল নম্রভাবে—আমি তাই করব বাবা।

ততক্ষণে তারা ইস্কুলে পৌছে গিয়েছে।

ইস্কুল বসার ঘণ্টা বাজছে—ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।

বাবা হাত ছাড়িয়ে তার পিঠে মৃদু আঘাত করে বলে—লক্ষ্মী ছেলে, চলে যাও।

সে ছুটে ইস্কুলের মধ্যে চলে যায়। যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকায়। তাকিয়েই প্রতিদিনের মত দেখতে পায় বাবা মোমবাতির আলোর মত স্নিগ্ধ হাসি মুখে নিয়ে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে জোর পায়। একবার বাবার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে হাসিমুখে ইস্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

তখনও ইস্কুলের ঘণ্টা বাজছে—ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।

তার মনেও বাবার ছোট্ট কথা ক'টি ঘণ্টার মত বেজে চলে—তুমি দরিদ্রের বন্ধু হবে।

দরিদ্রের বন্ধু সে হোক না হোক, তার একটি বন্ধু মিলল। সুন্দর বন্ধু।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, কচি কচি ছেলে আর মেয়ের সমারোহ সেখানে। খিলখিল অকারণ হাসি, কলকল করে পাখির ঝাঁকের মত কথা, মাঝে মাঝে অকারণ অশ্রুবর্ষণ।

মিস মর্গ্যান ইংরাজী পড়িয়ে চলে যাবার পর কি যে হল, তার পাশে বসে থাকতে থাকতে সাত বছরের লিজা ল্যাম্বার্ট হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মেয়েটা গত কয়েক দিন তার পাশে বসে লেখে, পড়ে, সুর করে সকলের সঙ্গে ছড়া বলে, একসঙ্গে ড্রিল করে। এতদিন মেয়েটার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে। আজ হঠাৎ কৌতুক, ব্যঙ্গ আর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় ঘটল।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর চোখ মুছছিল হাত দিয়ে। পাশে বসেছিল ডিক্ রবিনসন। ডিকি শক্ত-পোক্ত, দুঁদে বদমাশ ছেলে। সুযোগ পেলেই সহপাঠি-সহপাঠিনীদের জ্বালাতন করে, সময় সময় হাত চালাতেও তার সংশয় কি কুণ্ঠা নাই।

লিজাকে কাঁদতে দেখে ডিকি হাতের একটা আঙুল হঠাৎ তার দিকে উদ্যত করে হিহি করে হেসে উঠল—**Look, she has become so funny in her tears !**

বলে আবার হি হি করে হাসি।

লিজার কান্না বেড়ে গেল তাতে।

এই সময় ডেভিড তার মুখের দিকে তাকালে। বাদামী রঙের চুল নীল রিবন দিয়ে বাঁধা, মাঝখানে সাদা নরম সিঁথি, তার নীচে সাদা ধবধবে ছোট্ট কপাল, নরম নরম নধর মুখখানি, হাতের ফাঁকে চোখের নীল তারা যেন জমানো তরল নীল রঙের মত টলটল করছে নীলচে চোখের ক্ষেতের উপর। সেই নরম নরম তরল নীল চোখের তারা যেন গলে গলে পড়ছে জল হয়ে।

সে এমন সুন্দর মুখ তার ছোট্ট জীবনে আর দেখে নাই। আর একটি সুন্দর মুখ সে দেখেছে। পাকা আপেলের মত। সে মুখ তার মায়ের মুখ। কান্নায় তার পাউডার-মাজা গাল ভিজে উঠেছে।

তার বুকটা গভীর মমতায় মোচড় দিয়ে উঠল। সে তার পিঠে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে বললে—What's happened, Lizzy ?

লিজি কোন উত্তর দিলে না। বরং তার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল।

ডেভিড তার কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি গলা নামিয়ে বললে—কি হয়েছে আমাকে বল। দেখ আমি তার প্রতিকার করতে পারি কি না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই লিজি তাকে বললে—দেখ না, ডিকি আমার নতুন পেন্সিলের শিষটা কেমন ভেঙে দিলে! আমার বাবা আজ সকালেই দিয়েছিল পেন্সিলটা।

ডেভিডের বুকের ভিতরটা রাগে ফুঁসে উঠল। সে ডিকিকে রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—এই ডিকি, তুমি লিজার পেন্সিল ভেঙে দিলে কেন?

ডাকাবুকো দস্যি ডিকিকে যেন এ প্রশ্ন কেউ করতে পারে এ সে ভাবতেই পারে নি। সে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল অবাক হয়ে। তারপর একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—বেশ করেছি। তোমার কি? দরকার হলে, আমার ইচ্ছা হলে, আবার ভেঙে দেব।

—দিলেই হল আর কি? ডেভিড ফুঁসে উঠল।

—দিই যদি তুই কি করবি?

—তোকে মারব।

—কই মার দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে ডেভিডের ছোট্ট মুঠিটা সজোরে ডিকির মুখের দিকে ছুটে গেল।

ডিকি তো এই চাইছিল। উত্তরে তার ডান হাত বাঁ হাত চলতে লাগল সজোরে। সে পাড়ায় তার চেয়ে বড় ছেলেদের যে ভাবে 'কাট' দিতে দেখেছে, যা সে মনে মনে অনুকরণ করে রেখেছে, তাই সে ঝাড়তে লাগল ডেভিডের উপর এলোপাথাড়ি।

ডেভিড মার খেল, কিন্তু কাঁদল না। তার কপালে চোখের উপর কালশিটে পড়ল, ঠোঁট কেটে গিয়ে ফুলে উঠল, তবু সে কাঁদল না।

তাকে উপলক্ষ করে মারামারি দেখে লিজা অনেকক্ষণ আগেই কান্না থামিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু মার-খাওয়া ডেভিডের ফুলো কপাল আর কাটা ঠোঁটের উপর হাত বুলিয়ে সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

এবার তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল ডেভিডই—আমার লাগে নাই। I am not hurt. Don't Weep Lizzy. I have tolerated the pain and has become a friend of the oppressed like our Lord!

লিজি কান্না থামিয়ে তার সরল নীল চোখ বড় বড় করে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর বলেছিল—Where have you learnt it David? My mummy also speaks thus.

ফুলো কপাল আর কাটা ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। সে বলেছিল—Dose she ?

—Yes. But you look so funny with your swollen lips.

—Do I ? বলে আবার হেসে উঠেছিল ডেভিড। যেন সে একটা বৃহৎ কিছুতে জয়লাভ করেছে।

লিজির কথা তখনও শেষ হয়নি। সে বলেছিল—Are you angry with me ? But I love you so much for these wounds.

ডেভিড কিছুক্ষণের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। সে বললে—I also love you. But just wait. একটু অপেক্ষা কর। তোমাকে একটা জিনিস দেব।

তারপর সে নিজের ব্যাগ থেকে রঙ-পেন্সিলের বাক্সটা বার করে লিজির সামনে খুলে ধরলে।

লিজি লুব্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একবার তার মুখের দিকে, একবার রঙ-পেন্সিলের বাক্সটার দিকে তাকাতে লাগল। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে ডেভিড তাকে এই মহামূল্য বস্তু দিতে চায়। তাই প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও সে হাত বাড়াতে পারছে না।

ডেভিড হাসিমুখে বললে—নাও যে কোন একটা, any one.

লিজি আর অপেক্ষা করতে পারলে না, সে চট করে টুকটুকে লাল রঙের পেন্সিলটি তুলে নিলে।

ডেভিডের বুকখানা গুঁড়িয়ে গেল। তবু সে মুখের হাসি ঠিক রাখলে। লিজির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি খুশী ?

লিজির মুখে হাসি ঝলমল করছে। সে ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ। সে খুব খুশী।

তারপরই ভয়ে ভয়ে বললে—তোমার বাবা তোমাকে বকবে না ?

ডেভিড গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে—না, মোটেই না।

বাবা না বকলে কি হয় ক্লাস আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস-টিচারের নজরে পড়ে গেল তার কাটা ফোলা মুখ। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই সে একবার দেখে নিলে সংশ্লিষ্ট দু'জনের মুখ। দুখানি মুখই ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছে। সে শুধু মনে ভেবে নিলে কি বলবে। ক্লাস-টিচার তখন জিজ্ঞাসা করছেন—কি হয়েছে ? কে মারলে ?

অকুতোভয়ে সে বললে—খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়েছি।

—পড়ে গিয়েছিস? এই ডিকি, একে নিয়ে যা। হেডমাস্টারের ঘরে 'ফার্স্ট এড বক্স' আছে, তা থেকে আইডিন নিয়ে লাগিয়ে দে। তার আগে মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে দিস।

একটা অদ্ভুত লঘু মনে এক আশ্চর্য বিজয়-গৌরব নিয়ে সে ডিকির হাত ধরে বেরিয়ে গেল। পথে ডিকি বললে—তোর খুব লেগেছে না রে, আর মারব না তোকে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আইডিন নিতে নিতে সে বললে—আমার লাগেই নি। এই যে আইডিন দিচ্ছিস, অন্য লোকের কত জ্বালা করে। আমার কিচ্ছু হচ্ছে না।

ছুটির ঘণ্টা যখন বাজল তখন লিজির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে অন্য সকলের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

ডেভিডের বাবা প্রতিদিনই এ সময়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে হেসে বললে—ড্যাডি, আমার বন্ধু লিজি।

হাসতে গিয়েও বাবার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ছেলের মুখের ক্ষতগুলো ততক্ষণে তার চোখে পড়েছে। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলে—But how this happened? এমন লাগল কি করে?

সে কিছু বলবার আগে লিজি সবটা জড়িয়ে জড়িয়ে বললে। ডেভিডের কোন দোষ ছিল না। লিজির পেন্সিল ভাঙার কথায় ছুতো করে ডিকি বলে একটা ছেলে অন্যায় করে মেরেছে।

সব শুনে ডেভিডের বাবা শুধু বললে—ইস্কুলে ভদ্রভাবে থাকতে হয়, যেন মারামারি কোরো না কোন দিন। আর মাস্টারমশায়কে মিথ্যে কথা বলেছ, কাল তাঁর ঘরে গিয়ে স্বীকার করে এস, কেমন?

তারপর লিজিকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কোথায় থাক?

রাস্তার নাম জেনে বাবা বললে—কাছেই। চল তোমাকেও পৌঁছে দি।

ডেভিড আর লিজি পরস্পরের হাত ধরে নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে চলল বাবার সঙ্গে। তারা আগে আগে ছুটে চলে। বাবা কেবল পিছন থেকে মাঝে মাঝে বলে, অত জোরে নয়, আস্তে আস্তে চল। রাস্তায় নেমো না, ফুটপাতের উপর দিয়ে হাঁট।

এমনি এক দিন নয়, দিনের পর দিন!

হালকা বাতাস বয়, গাছের কচি পাতা কাঁপে, আলো ঝলমল করে,

গাছে গাছে ফুল ফোটে! তারই মধ্যে একটি ছোট ছেলে আর একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে পরস্পরের অভিজ্ঞতাহীন সরল চোখের দিকে তাকিয়ে অকারণ আনন্দের অর্থহীন হাসি হাসে। সে হাসিতে মুখ হাসে, চোখ হাসে, চোখের পিছনে সংসারের অভিজ্ঞতা-ভারহীন, অপাপবিদ্ধ প্রাণ হাসে।

লিজির গল্প আমার কাছে করে এই কথাটাই বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছিল। সেই আশ্চর্য অর্থহীন বন্ধুত্বের মহিমার ছায়া আজও তার কলুষিত চিত্তের মধ্য থেকে রক্তসন্ধ্যার স্বমহিমচ্ছায়ার মত রঙীন আলো ফেলে রেখেছে। সে আলোর কথা কারো কাছে সে বলতে পারে না। কে শুনবে তার কথা?

সেও হয়তো লিজির সঙ্গে এই বন্ধুত্বের কথা কবে ভুলে যেত যদি সেই আকাশচ্যুত আশ্চর্য আলোয় মাটির স্পর্শ লাগত কোন দিন। তা লাগেনি।

কিণ্ডারগার্টেনে পড়তে পড়তেই লিজি যেখান থেকে এসেছিল মর্তলোকে, সেইখানেই ফিরে গেল।

লিজির এই আকস্মিক মৃত্যুই লিজির স্মৃতির আশ্চর্য মহিমা তার জীবনে অক্ষয় করে রেখেছে।

লিজি পরপর দু দিন ইস্কুলে আসেনি।

ইস্কুলে নিজের পাশে তাকালে লিজির খালি জায়গাটা কেবল তাকে মনে পড়িয়ে দেয়। তার কেমন খারাপ লাগে।

সেদিন ইস্কুলের ছুটি হতে বাবার সঙ্গে সে লিজিদের বাড়ি গেল।

বাবা দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তার উপর, সে গেল উপরে।

লিজির মাও অফিসে যায় নি। সে বললে—লিজির অসুখ।

বলে তাকে নিয়ে লিজির বিছানার কাছে নিয়ে গেল।

রোগশয্যা থেকে তাকে দেখে ক্লিষ্ট হাসি হাসল লিজি।

সেই শেষ আর সে দেখতে পায়নি তাকে।

তার পরদিন যখন খোঁজ নিতে গেল তখন লিজির মায়ের চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে। শোক-গদগদ কথার মধ্যে সে কেবল জেনেছিল—সে আর নেই। She is no more.

এই 'আর নেই'-এর অর্থ সে কী বুঝবে? সে শুধু স্তম্ভিত হয়ে বোকার

মত দাঁড়িয়ে থেকে বিবর্ণ পাংশু মুখে ভয়ার্তের মত ছুটে নেমে গিয়েছিল বাবার কাছে এক ভয়ঙ্কর 'আর নেই'-এর কাছ থেকে আত্মরক্ষার তাড়নায়।

তবু সে বাবা আর মায়ের হাত ধরে মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে গিয়েছিল লিজির নিঃশব্দ শবযাত্রার সঙ্গে। কফিনের মধ্যে লিজি আপনার রবিবারের সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে কবরের মধ্যে চলে গেল। তার চোখের সামনে।

সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, তাই কাঁদতে পারে নি।

কিন্তু সে কাঁদল, কাঁদতে হল একদিন।

রবিবার দিন সকালে গির্জার প্রায়ান্ধকার বিশাল কক্ষে যখন সমবেত প্রার্থনার সঙ্গীতধ্বনি সুবিশাল ঘরখানাকে পরিপূর্ণ করে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল এক বিশাল রোদনসমুদ্রের তরঙ্গের মত, তখন সেই প্রার্থনার সঙ্গীতের মালা তার কাছে ছিঁড়ে গিয়ে অশ্রুমুক্তার রাশির মত ঝরতে লাগল। সে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

একপাশে মা, অন্য পাশে বাবা, সামনে অলটারে ঈশ্বরের ছায়া।

তবু অনন্তব্যাপ্ত এক দুঃখের বেদনায় তার বুকের ভিতরে কান্নার দুর্নিবার ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

দু পাশ থেকে বাবা আর মায়ের দুখানা হাত তার পিঠের উপর এসে পড়েছে। তাতে যেন দুঃখ আরও বেড়ে গেল।

সে আশ্চর্য বেদনাকে আমার কাছে ঠিক পরিস্ফুট করে তুলতে পারেনি ডেভিড।

পারার কথাও নয় অবশ্য।

কারণ যে বেদনা বহু দিন সে পার হয়েছে, যে মনকে সে বহুদিন আগে হারিয়ে এসেছে, যে বেদনা সেদিনেই তার কাছে তার অতি গাঢ় তীব্রতা সত্ত্বেও অস্ফুট হয়ে গিয়েছিল তাকে কি প্রকাশ করতে পারে সে? সেই তার জীবনে প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা; সেই তার প্রথম ভালবাসার অভিজ্ঞতা, যে ভালবাসা ভালবেসে অপরিচিতকে আপনার করে নিয়ে পেতে হয়; যে ভালবাসা অস্ফুট কিন্তু অতি তীব্র; যে ভালবাসা সে পেয়েছিল এবং পেয়ে হারিয়েছিল।

আজ সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে সে আকুলই হয়ে গেল, কিন্তু প্রকাশ করতে পারলে না।

কিন্তু সেই সময়ের আর একটি ঘটনা বলেছিল ডেভিড।

লিজার মৃত্যুতে জীবনটা কেমন উৎসবহীন হয়ে পড়েছিল। স্কুলের ছুটির পর একা একা বাড়ি আসবার পথে অকারণেই লিজাদের বাড়ির পাশ হয়ে ঘুরে আসত। তখন দুপুরের সাদা রৌদ্রে সন্ত পড়ন্ত বেলার হলুদ রঙ লাগতে শুরু করে। প্রায়-জনহীন, প্রায়-নীরব পথে পথে স্কুলের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হয় জীবনে যেন আর কোন আনন্দ নাই; যেন কত বেদনা জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত বুকের মধ্যে তিল তিল করে জমা হয়ে দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ছে।

এমনি অবস্থায় একদিন দুপুরবেলা টিফিনের সময় সে হঠাৎ স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে আসার কোন উদ্দেশ্য নাই। কোথায় যে যাবে তার কোন বিশেষ চিন্তা নাই। তবু যেন মনের মধ্যে একটা বিশেষ গন্তব্যের তাগিদ আছে।

সে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হল গির্জার প্রাঙ্গণে।

স্বল্পপরিসর বাগানে মরশুমী ফুলের গাছে দু-চারটে করে ফুল ফুটে আছে। তারই উপর দ্বিপ্রহরের সাদা রৌদ্র পড়ে নিস্তব্ধ নিথর জায়গাটাকে কেমন উদাস করে তুলেছে।

সে আস্তে আস্তে গির্জার ভিতরে যাবার জন্য একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল।

—কিয়া মাংতা হ্যায় বাবালোক? গির্জার বুড়ো চাপরাশী তাকে অসময়ে একা এমন জায়গায় দেখে একটু অবাক হয়ে বললে। তারপর সে যেন আপন মনে তার এখানে এ সময়ে আসার একটা উত্তর খুঁজে নিল। বললে—কিয়া ডেভি বাবা, মামি তো নেহি আয়া হ্যায়!

—আমি এমনি এসেছি। উত্তর দিয়ে ততক্ষণে সে মস্ত বড় দরজাটার কাছে এসে পড়েছে।

মস্ত বড়, প্রায় বিশ ফুট উঁচু দরজার কাছে সাড়ে তিন ফুট মাপের ছোট্ট ছেলেটি নিজেকেই কেমন অতি ক্ষুদ্র অনুভব করতে লাগল। আর তেমনি অসহায় লাগতে লাগল তার।

—ভিতরে যাব একবার? ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরের প্রায়ান্ধকার বিপুল পরিসরটিকে আবছা আবছা লক্ষ্য করতে করতে সে বুড়ো দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে।

—কিয়া, ভিতর যানে মাংতা? যাও, চলা যাও! কিয়া কনফেস করেগা?

সে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বিপুল-পরিসর, সুবিশাল ঘরখানা শান্ত নীরবতা আর আবছা অন্ধকারের মধ্যে যেন ডুবে আছে। ভেতরটা কত বড়, অন্ধকার, কত নিস্তব্ধ, আর কি ঠাণ্ডা! বড় বড়, লম্বাটে, নানান রঙের ঘষা কাঁচ-বসানো জানলাগুলো ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা।

সামনে অনেক অনেক উঁচু বেদী।

তাকে প্রায় মাথাটা আকাশ-দেখার মত উঁচু করে তাকাতে হল।

একা নিরিবিলি দাঁড়িয়ে থাকতে তার প্রথমটা কেমন ভয় ভয় লাগছিল। কিন্তু ভয়টা কেটে গেল অলটারের পিছনে, অনেক উঁচুতে জানলার দিকে তাকিয়ে।

দু-পাশে সরানো পর্দার মাঝখানে কাঁচের উপরে আঁকা ক্রুশবিদ্ধ যিসাসের দীর্ঘ ছবি যেন তাকে সঙ্গ দিতে লাগল। সে আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসল, চোখ বন্ধ করলে।

বন্ধ চোখের সামনে যেন আস্তে আস্তে একটি ছবি কেমন করে ফুটে উঠল। তার মনে হল যেন ঐ অতি দীর্ঘ ক্রুশবিদ্ধ যিসাসের পায়ের কাছে, হাত জোড় করে রঙীন ফ্রক পরে, চুলে রিবন বেঁধে বসে আছে লিজা।

সে গল্প বলে যাচ্ছে, আমি শুনছি।

আমার হাতের কাজ সেদিনের মত শেষ করেছি। তার গল্প শুনছি।

বাইরে সূর্য কিছুক্ষণ আগে অস্ত গিয়েছে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে। সেই আবছা অন্ধকারে, নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মনে হল আমার ঘরখানাই যেন পরিসরে অনেক বেড়ে গিয়ে গির্জার ঘরের পরিসর লাভ করেছে। আর আমি নিজে যেন সেই সাত বছরের শিশুর মত হাঁটু গেড়ে বসে আছি।

অকস্মাৎ বাইরে কিসের শব্দে যেন আমার আচ্ছন্নতা ছুটে গেল।

আমি চেয়ার থেকে উঠে তার পিঠে মৃদু করাঘাত করে বললাম—যাও, আজ তোমার ছুটি!

ডেভিডও চলে গেল। আমিও উঠলাম।

তার গল্পের গুণে গির্জার ঘরের বিষণ্ণ ম্লান ছায়ার মত আমার মনের

উপরও যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। সেটা কাটাবার জন্যেই জেলার মিঃ সরকারের কাছে গিয়ে বসলাম।

—কি ব্যাপার মিঃ ব্যানার্জী? এত গ্লানি কেন?

আমি হাসলাম। বললাম—না। সে রকম কিছু নয়!

মিঃ সরকার বললেন—তারপর আপনার লেখা কতদূর?

হেসে বললাম—চলেছে। লিখছি আর ডেভিডের গল্প শুনছি।

মিঃ সরকার অবাক হয়ে বললেন—ডেভিডের কি গল্প শুনেছেন? কি গল্প বলছে ডেভিড? ওর এত কি আছে?

—আছে তো দেখছি!

—যে গল্প তার কাছ থেকে শুনেছেন তা এই ডেভিডের সঙ্গে মিলছে?

খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চুপ করে থেকে বললাম—তা অবশ্য মিলছে না! কারণ সে ডেভিড তো আর নেই।

—ঠিক বলেছেন। সেই এক ইটালিয়ান আর্টিস্টের গল্প আছে—তিনি একটি দেবদূতের মুখ আঁকবেন বলে একটি শিশু অনেক খুঁজে নিয়ে এলেন। আঁকলেন তার মুখ। এর অনেক কাল পরে শয়তানের মুখ আঁকবার জন্যে জেলের ভিতর থেকে অনেক খুঁজে আর একখানা মুখ এঁকে নিয়ে এলেন। এর মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপারটা কি জানেন? ঐ দুটো ছবির দুটি মুখ একই মানুষের। একদিনের দেবদূত অন্য দিনে শয়তান হয়ে গিয়েছে।

সে কথা ঠিকই। তা হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এটা একটা extreme case। কোন মানুষ কোনদিন দেবদূত থাকে না, আর কোন মানুষ কোনদিন শয়তানও হয়ে যায় না। It is in ourselves that we are thus and thus.

মিঃ সরকার একটু হাসলেন—শেক্‌স্‌পীয়রের দোহাই দিয়ে পার হয়ে গেলেন ভাল। কিন্তু মানুষ কখনও কখনও একেবারে শয়তান হয়ে যে যায় না তাই বা বলব কি করে?

আমি মিঃ সরকারের মুখের দিকে তাকালাম।

—জানেন মিঃ ব্যানার্জী, ডেভিডের অপরাধ কি?

—না।

মিঃ সরকার আমার কাছে সরে এসে আমার কানে কানে ফিসফিস করে ছোট্ট একটি কথা বললেন, যার মর্মার্থ অতি গ্লানিকর, যা মিঃ

সরকার আমার চোখে চোখ রেখে সহজ গলায় বলতে সংকোচ বোধ করলেন। ডেভিড কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বলপূর্বক ভোগ করেছে। তার জন্য তার মেয়াদ হয়েছে সাত বৎসর।

আমার চোখের সামনে পৃথিবী যেন কালো কুৎসিত হয়ে গেল। মনে হল সে যেন কুটিলা এক জরতী যার মনে ভয়াল অন্ধকারে শুধু লুকানো আছে লক্ষ সরীসৃপ, যারা সুযোগ পেলেই বিষদন্ত বের করে।

মাথা হেঁট করে বসে থাকলাম। ওই মানুষটার সঙ্গ করেছি বলে নিজেকেও যেন কেমন পাপভাগী মনে হতে লাগল।

আমার গ্লানিবোধ দেখে মিঃ সরকার হাসলেন,—এই শুনেই শকৃড্ হয়ে গেলেন? এই তো একটু আগে বলছিলেন না—**We are thus and thus**, আমরা এমনিই!

মিঃ সরকার আরও বললেন—আপনারা জীবনের পরিধি কতদূর ব্যাপ্ত তা ঠিক অনুমান করতে পারবেন না। সেই জন্যেই এত শকৃড্ হন। যদি জানেন, জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই জানেন কিছু। তাই বা কতটুকু জানেন!

মৃদু তিরস্কারটুকু সহ্য করতে হল। সহ্য করেই উঠলাম। বললাম—আজ তা হলে উঠি।

হেসে মিঃ সরকার বললেন—উঠুন। মানুষ এমনিই মিঃ ব্যানার্জী। ও নিয়ে মনে কষ্ট করে লাভ নেই। আমার আপনার মন-গড়া ধারণার সঙ্গে মিলে পৃথিবী চলে না বা কেন চলছে না এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুধু দেখে যাওয়াই ভাল।

শুধু দেখে যাওয়াই ভাল?

তাই কি হয়? দেখব, দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুখ পাব, দুঃখ পাব।

পেলামও তো। ডেভিডের কথা ভেবে, তার দুষ্কৃতির কথা মনে হতে মনটা যে ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই যে বিছানায় শুয়ে আছি বিচিত্র চোখে, রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে, সেও তো এই বেদনা-বোধের জন্যই।

আমার মাথার মধ্যে কালিদাস, ভাস, শূদ্রক, ভবভূতি—এঁরা তাঁদের কমনীয়, সুকুমার, লাবণ্যময় মানব মানবী নিয়ে আমার কল্পনার মধ্যে যে স্বপ্নজাল রচনা করেছিলেন, মর্তলোকের এক সংবাদের ঝড়ো হাওয়ায় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।

সকলের অজ্ঞাতে বকুলের ছায়ায় যখন একটি তরুণ আর একটি তরুণীর দিকে সঙ্গীতের সুরের মত তাকায় তখন মিথুন-লীলার আদি সঙ্গীত গীত হয়। তাতে কত ভয়, কত সংকোচ, কত আনন্দ, কত লীলা, কত কৌতুক! পৃথিবীর কবিরা সেই লীলা গান করেন। যা শুনে তরুণের বুকে জাগ্রত হয় দুর্বার, সব ভয়-সংশয়-ছেদী পবিত্র সাহস, তরুণীর মুখে রক্তোচ্ছ্বাস গাঢ় হয়, চোখের দৃষ্টি লজ্জায় নত-নম্র হয়ে পড়ে, বুকের মধ্যে প্রেমের পদ্ম গাঢ় বর্ণে অতি সংগোপনে ফুটে ওঠে। তরুণ তখন তরুণীর চিত্র আঁকে সংগোপনে। অন্য কারো দৃষ্টি পড়লে সে কত লজ্জা!

সে শুধু লজ্জাই! সে লজ্জায় কত কৌতুক! যে দেখে সেও তার মধ্যে সেই সকৌতুক লীলা-রহস্য অনুভব করে।

কিন্তু ডেভিড?

তাই তার মুখখানা শবের মত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শুধু ভয়ে, শুধু অপরাধবোধে।

সে তো প্রেমিক নয়, সে অপরাধী। প্রেমের বেদনা তো তার নয়, অপরাধের অন্তহীন প্রায়শ্চিত্ত তার জন্য অপেক্ষা করছে।

তিন

পরদিন সকাল।

রাত্রির বিশ্রাম ও নিদ্রার অবসানে নব জীবন লাভ করলাম যেন। সকাল বেলায় প্রসন্ন মনে নিজের কাজে বসলাম। মহাকবিরা আবার সদলে সকৌতুক প্রসন্নতা নিয়ে আমার চিন্তার ও কল্পনার মধ্যে ফিরে এসেছেন। তাঁদের সাহচর্যে বেশ নিজের কাজের মধ্যে মগ্ন ছিলাম।

—গুড মর্নিং স্যার!

ডেভিড এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্য দিনের মতই ডেভিড এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিদিনের মতই তার সম্ভাষণ ফেরত দিয়ে বললাম—গুড মর্নিং!

অন্যদিনের মত—সম্ভাষণের সঙ্গে তার নামটি সস্নেহে যুক্ত হল না, কিংবা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আজ আমার মুখে হাসিও স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে ফুটল না।

তার মুখে প্রতিদিনের মত স্নেহ-প্রত্যাশী হাসি ফুটে উঠেছে। আমার মুখে তার প্রতিচ্ছায়া না দেখে তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। আমার কাছ থেকে বোধ হয় দু-একটি মিষ্ট কথার প্রত্যাশায় সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু আমার মন ততক্ষণে আবার নিজের কাজেই মগ্ন করে দিয়েছি ইচ্ছা করে। তাই তার দিকে আর তাকালাম না। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে শুষ্কভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কোন কাজ আছে স্যার?

আমিও শুষ্কভাবে বললাম—না। তোমার যা করবার আছে কর। কাজ না থাকে চলে যাও।

সে আমার কথা শুনে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘরের খাটের তলা থেকে ঝাঁটা বের করে সে ঘরে ঝাড়ু দিতে লাগল।

ওর গভীর দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে ওর দিকে তাকাতে আর আমার ইচ্ছা করছে না। ওর উপস্থিতি মাত্রেই আমার মনটি কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজের লেখার দিকে শুধু চেয়ে বসে আছি। চিন্তার সূত্র

ছিঁড়ে গিয়েছে, হাতের কলম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিজের লেখার দিকে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও জানতে পারছি—ডেভিড ঘরের মধ্যে ঝাড়ু দিচ্ছে—খস্, খস্, খস্, খস্।

এক সময় ঝাড়ুর শব্দ থামল। ঝাড়ু তুলে রেখে সে আমার বাসি জামাকাপড় ও গামছা নিয়ে চলে গেল। কেচে এনে বারান্দায় মেলে দিলে।

তারপর একবার জিজ্ঞাসা করলে—আর কোন কাজ আছে?

বললাম—না।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

লেখার কাজে কখন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। যখন খেয়াল হল তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। লেখার কাগজপত্র গুটিয়ে স্নানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

অন্যদিন ডেভিড দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। আজ সে চলে গিয়েছে। আমিই তাকে যেতে বলেছি। আমি স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। স্নানের সময় যা যা দরকার সব ঠিক সাজিয়ে রেখে গিয়েছে ডেভিড। গামছা-কাপড় থেকে গুঁড়ো খড়ি পর্যন্ত।

স্নান করে বেরিয়ে এসে মাথায় চিরুনি দিতে দিতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত শরীরে শীতল জল পড়ে শরীর-মনের চেহারা পালটে গিয়েছে। চোখের সামনে দ্বিপ্রহরের তীক্ষ্ণ-রৌদ্র-স্নাত পৃথিবীকে কোন্ দুরূহ তপস্যায় ধ্যানমগ্নের মত মনে হচ্ছে।

অকস্মাৎ নজরে পড়ল মেঝের একটা কোণ।

কোণে একটি ছবি আঁকা।

আমার চোখের সামনে ক্রশটা পড়েছে লম্বালম্বি। সেই ক্রুশের উপর বিদ্ধ মানবপুত্র ক্লান্ত অবসন্নতায় প্রাণত্যাগ করেছেন। লক্ষ লক্ষ ক্রুশবিদ্ধ যিশুর যে কনভেন্‌শলাল ছবি গির্জার প্যানেল থেকে ক্যালেণ্ডারের গায়ে আঁকা হয় সেই ছবিরই প্রতিলিপি। মাথা, হাত, কোমর এবং পা যেমন ভাবে সর্বত্র আঁকা হয় এও তাই। এর তো একটা ধাঁচ এবং ফর্ম তৈরী হয়েই আছে; তবে মুখখানাকে এই ছবিতে অস্বাভাবিক লম্বা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে করে ক্লেশের ছবিটা ফুটে উঠেছে জোরালো হয়ে। অনেকটা বাইজেনটাইন ক্রাইস্টের মুখের মত।

বুঝলাম ডেভিড এঁকে গিয়েছে। শুধু এইটুকুই বুঝলাম না। আরও বুঝলাম মনের কোন যন্ত্রণা এই ছবি আঁকবার প্রেরণা জুগিয়েছে তাকে। মনের ক্লেশবোধে সে শুধু মানবপুত্রের ছবি এঁকে নিজের ক্লেশকেই শুধু এই ছবির পায়ে সমর্পণ করবার চেষ্টা করে নি, নিজের ক্লেশের একটা বৃহৎ অংশও সে সর্ব মানবের ক্লেশের স্বেচ্ছাংশভাগী মানবপুত্রের ক্লিষ্ট মুখে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে।

দেখে মনে একটা আকুল মমতা অনুভব করলাম। মনে মনে ঠিক করলাম ডেভিড বিকেলে এলে আবার তাকে সমাদর করে আহ্বান করব।

মনে হল—আমি তো বিচারক নই। আমিও তো তারই মত একজন অতি সাধারণ মানুষ। আমি তার বেদনার অংশ গ্রহণ করতে পারি, তাকে মমতা দিয়ে সংশোধন করতে পারি। তাকে বিচার করবার, ধিক্কার দেবার আমার কোন্ অধিকার?

বিকেল বেলাও সে এল না।

এল যখন সূর্য অস্ত গিয়েছে, সন্ধ্যার ছায়া যখন ম্লান হয়ে নেমে আসছে, অথচ ঘরে আলো জ্বলেনি তখন। বুঝলাম আমার সেই শুষ্ক, আবেগহীন, ধিক্কার-মেশানো, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার দৃষ্টি সে আর দেখতে চায় না। তা সহ্য করতে পারবে না সে। নিজের শুকনো ম্লান মুখখানাও সে দেখাতে চায় না আমাকে।

তবু আমার মনে হল তার মুখখানা ঐ ছবির দীর্ঘ, ক্লিষ্ট মুখখানার মতই লম্বা হয়ে গিয়েছে।

আবছা অন্ধকারে মধ্যেই সস্নেহে ডাকলাম—ডেভিড।

যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে না নড়ে সে জবাব দিলে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে—স্যার!

—সারাদিন কোথায় ছিলে? এলে না একবার?

অন্ধকারের মধ্যেই ছায়ামূর্তির মত সরে এল আমার কাছে। আমার কথার জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে বললে—আমার একটা প্রার্থনা ছিল আপনার কাছে।

সাগ্রহ ও সস্নেহে বললাম—বল।

—আমাকে আবার বাগানের কাজে ফিরিয়ে দিন। আপনি বরং কোন ভাল লোক চেয়ে নিন মিঃ জেলারের কাছ থেকে। আমার চেয়ে কোন ভাল লোক।

বুঝলাম তার কথা। বুঝলাম এই কথার পিছনে যে বেদনার বার্তা আমার কাছে অনুক্ত রইল তার কথা। গভীর স্নেহের সঙ্গে বললাম—কেন?

সে কোন জবাব দিলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার ধারণা আমি ডেভিডকে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি। যে অপরাধ করে, যার পাহাড়প্রমাণ বোঝা জেলবাসের শাস্তি হিসেবে বহির্লোকে ঘাড়ে করে এবং অন্তরলোকে বুকে করে সে এখানে এসেছে, তারই চাপে চোখে এবং মনে ভয় আর অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুরই স্থান হয় নাই। তারই প্রকাশ হত লঘু চপলতা আর বাচালতা করে। তাই দিয়ে প্রতি মুহূর্তে নিজের অসম্মান করে সে এখানে করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করে। আমার সমাদরে ও স্নেহে ও মনের মধ্যে যে আত্মসম্মান আবার নবজন্ম লাভ করেছে, আজ তারই অসম্মানে সে অভিমান বোধ করছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

ডেভিড চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেখলাম একসময় সে অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

আগের দিন সন্ধ্যায় যে অন্ধকারের মধ্যে ডেভিড মিলিয়ে গিয়েছিল পরদিন ভোরে সেই অন্ধকার থেকেই বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল ডেভিড।

—গুড মর্নিং স্যার!

—গুড মর্নিং ডেভিড। কিন্তু এত সকালে যে? একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ডেভিড একটু সলজ্জ হাসি হেসে মুখ নামালে। তারপর আমাকে এড়িয়ে গিয়ে খাটের তলা থেকে ঝাড়ু বের করে নিলে। আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

ডেভিড আর আমাকে আমার কাজ থেকে বাগানের কাজে বদলি করে দেবার অনুরোধ করলে না। কিন্তু আগের হাসি এবং স্বচ্ছন্দভাব আর ফিরে এল না। যে ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তাতে কোথাও যেন ফাটল ধরেছে।

আমার মনে হতে লাগল যে আমার হৃদ্য আন্তরিকতার স্পর্শে ওর যে মনটি আস্তে আস্তে ফুটতে আরম্ভ করেছিল সে যেন আমার শুষ্কতায়

ম্লান হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তাকে সঞ্জীবিত করে তোলার দায় যেন কতকটা আমারই।

সে দিন আমিই কথাটা পাড়লাম, বললাম—সেদিন ক্রুশিফায়েড যেসাসের ছবিটা কিন্তু বেশ এঁকেছিলে! আচ্ছা ডেভিড, তুমি ছবি আঁকা শেখনি কেন?

ডেভিড একটু হাসল শুধু। জবাব দিলে না।

আমি তাকে কথা বলাবই আমার প্রতিজ্ঞা। আবার জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি জেলে আসবার আগে কি করতে?

ডেভিড হেসে বললে—আমি মোটর-মেকানিকের কাজ করতাম স্যার।—কারখানায়।

কারখানার নামটাও আমি শুনেছি যদিও আমার মোটর নাই। মস্ত নামকরা কারখানা!

অবাক হয়ে বললাম—তাই নাকি? কিন্তু যা দেখলাম তাতে তো তোমার আর্টিস্ট হবার কথা। তার বদলে তুমি মোটর-মেকানিক হলে কেমন করে?

ডেভিড হেসে বললে—সে অনেক লম্বা গল্প স্যার!

আমি তার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকালাম। আমি জানি ও এইবার মুখ খুলবে! আমার মত অনুসন্ধিৎসু, সহৃদয়, শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণীর শ্রোতা সে যে জীবনে পায় নাই তা আমি অনুমান করতে পারি। আর সেই সঙ্গে এও জানি যে নিজের মনের কথা, নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত উলঙ্গ করে, বলবার জন্য যে মন, যে পরিবেশ ও অবকাশ প্রয়োজন তাও তার জীবনে কখনও আসেনি। আমি জানি, নিজেকে আমার কাছে অনাবৃত করে ধরবার আন্তরিক আগ্রহে সে মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সেই সব কথা সে এইবার বলবে—তাই তাকে আবার অনুরোধ করলাম—বল শুনি।

সে বলতে লাগল:

—যে দিন সেই সবুজ বিল্লী এঁকেছিলাম সেই দিন থেকে মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম—আমি আর্টিস্ট হব। বাবাও সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমার বাবা জন রোজারিও ছিলেন এক ইংরিজি স্কুলের মাস্টার। মায়ের অনুরোধে আমাকে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়বার সময় নিজে সপ্তাহে দু'দিন করে ছুটির পর নিয়ে যেতেন তাঁর স্কুলে তাঁদের ড্রইং টিচারের ঘরে।

আজও পরিষ্কার মনে আছে তাঁর কাছে যেতাম বুধবার আর শনিবার। যতদিন কে-জিতে পড়েছি ততদিন এর কোন রকম বদল হয়নি। বাবা হতে দেন নি।

মনে আছে ড্রইং মাস্টারের নাম ছিল প্যাট্রিক নোরানা। বড় বড় চোখ, মস্ত লম্বা, বিরাট এক জোড়া গোঁফ। তাঁর সব কিছু বড় বড়। মুখের মধ্যে বড় বড় চোখে তারাগুলো কেমন অবাধ্য ছাত্রের মত চঞ্চল হয়ে ফিরত তাঁর আবেগের মুহূর্তে। কিন্তু তিনি রেগেছেন কি খুশী হয়েছেন তা সব সময় বোঝা যেত না—তাঁর মস্ত বড় গোঁফের তলায় তাঁর ঠোঁট সব সময় ঢাকা থাকত বলে।

আমি গেলেই তিনি আমাকে নিয়ে একটা কোণের ঘরে যেতেন। গম্ভীর হয়ে বলতেন—বেঞ্চে বস, খাতা খোল, পেন্সিল নাও। এইবার তাকাও বোর্ডের দিকে।

তারপরেই তাঁর হাতের চক চলতে আরম্ভ করত বোর্ডের উপর। তিনি দুইতল-বিশিষ্ট, তারপর তিনতল-বিশিষ্ট বস্তু এঁকে যেতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নকল করতে হত।

প্রায় বছর দুয়েক পরে একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। ফাদার নর্টন, সব কিছু তাঁর সাদা ধবধবে, চুল, রঙ, সারপ্লিস সব। মিঃ প্যাট্রিক নোরানা বললেন—গুড ইভনিং ফাদার! এই আমাদের জনের ছেলে, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম।

ফাদার চেয়ার চেড়ে উঠে এসে আমার পিঠে সস্নেহে কয়েকটা চাপড় মারলেন, তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি, খাতা দেখি।

মিঃ প্যাট্রিক নোরানা আমার আঁকা খাতা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। দেখলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—ও কখন আমার স্কুলে আসছে?

—সামনের বছর।

—ভেরি ওয়েল, দেন আই শ্যাল সি দ্যাট হি বিকাম্‌স্ অ্যান অ্যার্টিস্ট অ্যালং উইথ হ্যাভিং এ গুড এডুকেশন।

আমাকে ফাদার নর্টন একটা মস্ত বড় কলার বক্স দিয়েছিলেন সেদিন।

সেদিন বাবার হাত ধরে বাড়ি আসতে আসতে মনে হয়েছিল আর্টিস্ট হবার রাস্তাতেই হেঁটে চলেছি আমি। কিন্তু সেদিন কি আমি জানতাম আমার ভবিষ্যৎ?

জানতাম না। কি করে জানব?

একটি ভদ্রঘরের ছেলে যা দেখে, যা ভাবে, যা খায়, যা বলে, আমিও তাই দেখেছি, খেয়েছি, বলেছি।

জানেন স্যার, আমার জীবনের সমস্ত সুখ যেন আমার জীবনের প্রথম ক'বছরের জন্যই ছিল।

আমার মা! আমার মায়ের মত অমন মা কারও হয় না! আমার মায়ের কোমলতা আর মধুরতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমার মাকে আজও এই মুহূর্তে পরিষ্কার মনে পড়ছে। নরম নরম চেহারা, বেশ লম্বা, রঙটা খুব ফর্সা হয়েও একটু হলুদের আমেজ-লাগানো। বড় বড় চোখ, সে চোখ শুধু দেখে, সহ্য করে, আর জল ফেলে। সব সময় ঠাণ্ডা। শুধু খুশীতে কখনও কখনও একটু চিকচিক করত, আবার কান্নায় কখনও কখনও বর্ষার মেঘের মত নরম হয়ে আসত। মুখখানি দেখলেই মনে হত মা যেন একটু হাসছে। সুখের সময় সহজ হাসিটি প্রকাশ পেত। দুঃখের সময় মনে হত মা যেন অপ্রস্তুত হয়ে হাসছে।

বলতে বলতে থমকে গেল ডেভিড। একটু হেসে বললে—Excuse me sir, আমি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।

আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম—তাতে কি! তুমি ভাবপ্রবণ না হয়ে পড়লেই অন্যায় হত। হাজার হোক তিনি তোমার মা।

ডেভিড বললে—আমার মা আমাকে কখনও একটা খারাপ কথা বলেনি স্যার। সময় সময় মনে হয়—আমার মা-ই একমাত্র স্ত্রীলোক যে আমাকে ভালবেসেছিল।

বলেই ডেভিড আকস্মিকভাবে চুপ করে গেল। মনে হল যেন কথাটা ঠিক ওভাবে বলার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—কথাটা এই যে স্ত্রীজাতির সমস্ত ভালবাসা আমি আমার মায়ের হাত দিয়েই পেয়ে গিয়েছি।

অনেকটা আপন মনেই সে যেন বলতে লাগল—আমার তখন মনে হত আমি যেদিন ভাল করে আঁকতে পারব সেই দিন সর্বপ্রথমে আঁকব আমার মায়ের ছবি।

তারপর হেসে বললে—ভাল করে ছবি আঁকা আর আমার কোনদিন হল না। কিন্তু মায়ের একখানা ছবি আমি এঁকেছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সে ছবি কোথায়?

সে হাসল, বললে—যেমন করে আমার সব হারিয়ে গিয়েছে, সেও

হারিয়েছে তেমনি করে। জানেন স্যার, সে দিনের কথাটা আমার আজও পরিষ্কার মনে আছে।

সেদিন, আমার একাদশ জন্মতিথি।

তার আগের দিন রাত্রিতে আমি ঠিক করেছিলাম প্রথমে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে, তারপর রঙ দিয়ে মায়ের একখানা ছবি আঁকব। এবং সেইটাই হবে আমার জন্মদিনের প্রথম কাজ। সকালে গোপনে সেটা করে রাত্রিতে খাবার টেবিলে বাবাকে উপহার দেব। বাবার আর মায়ের বিবাহের সময়ের একখানা ছবি ছিল। সেই ছবিখানা রাত্রিতে সরিয়ে আমার দপ্তরের সঙ্গে রেখে দিলাম।

পরের দিন সকাল বেলা বসলাম আমার পড়ার টেবিলে। আমি না পড়ে যখন তখন ছবি আঁকতাম। তাতে বাবা-মা কিছু বলতেন না। আমার গলা অনেকক্ষণ না শুনলে কখনো-সখনো বাবা বলতেন—বাবা, ছবি আঁকতে বারণ করছি না। বড় হয়ে তো ছবিই আঁকবে। এখন একটু একটু পড়। তোমার ছবি আঁকার কাজেই লাগবে এ সব। তবে সেদিন তো আমার জন্মদিন! কাজেই আমি জানতাম বাবাও আজ কিছু বলবেন না।

ছবি আঁকার বড় কাগজ, অন্য সব সরঞ্জাম জোগাড় করে রেখে-ছিলাম। বাবা-মায়ের বিয়ের সময় তোলা ছবিটি সামনে রেখে পেন্সিল চালাতে লাগলাম কাগজখানার উপর। প্রায় ঘণ্টা দুই পরিশ্রম করে ছবিখানার নকল-স্কেচ মন্দ দাঁড়াল না।

দেখে বেশ ভালই লাগল।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল রঙ চাপিয়ে ছবিখানাকে সুন্দরতর করবার জন্যে।

রঙ চাপাতে গিয়েই কিন্তু ছবিখানা নষ্ট হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে মনোমত করতে পারলাম না।

মায়ের মুখখানা কি রকম হয়ে গেল। মায়ের মুখে হাসিটি পর্যন্ত ঠিক দিয়েছিলাম, সে হাসিও নষ্ট হয়ে গেল। তখন কি করি, কি করি!

করার আর কোন উপায় নেই তখন। আমি সেটা সঠিক বুঝেছি। বুঝে কাঁদতে আরম্ভ করেছি। আমার আরও খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আজ আমার জন্মদিন। সেদিনে আমার প্রথম কাজটা নষ্ট হয়ে গেল। সেই জন্যে আরও কান্না পাচ্ছিল আমার।

মা যে কখন এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে কিছুই বুঝতে পারি নি।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আমার মাথায় হাত দিয়ে মা বললে—কি হল ডেভিড, যে অমন করে কাঁদছ? কি হয়েছে?

আমি টেবিলে মাথা রেখে ঘাড় নেড়ে বললাম—না, কিছু হয়নি।

মায়ের অনেক অনুরোধে কথাটা বলব কি না ভাবছি এমন সময় মা-ই আমার হাতের তলা থেকে ছবিখানা টেনে বের করে বললে—আরে, তুই আমার ছবি এঁকেছিস দেখছি? বাঃ, সুন্দর হয়েছে!

—কিছু হয়নি। ছবিখানা দাও।

—দোব কি? আমি এটা এক্ষুনি বাঁধাতে দিয়ে আসব।

—ওটা কিচ্ছু হয়নি। আমি ওটা নষ্ট করে ফেলেছি।

মা এবার অবাক হল, বললে—নষ্ট করে ফেললি কোথায়? এ তো ঠিকই আছে।

আমার কান্না অনেকগুণ বেড়ে গেল। রেগে কেঁদে বললাম—না, ঠিক নেই। ওটা আমি নষ্ট করে ফেলেছি। তুমি কিছু বোঝ না। দাও ওটা আমাকে।

আমার মায়ের চোখেও জল ঝরে পড়তে লাগল। তিনি বললেন—কি বলছিস তুই? চমৎকার ছবি হয়েছে। এমন কি আমার ঠোঁটের হাসিটা শুদ্ধ দিতে ভুল হয়নি তোর। সব ঠিক হয়েছে।

মায়ের কথায় আমার বিশ্বাস ফিরে এল। মায়ের চোখের জল আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিলে।

সেদিন তো বুঝতে পারিনি আমার মায়ের চোখে জল কেন এসেছিল। আমার ছবির উৎকর্ষে সে জল আসেনি নিশ্চয়। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মায়ের চোখে জল এসেছিল আমার অন্তরের ভালবাসা অনুভব করে।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে ডেভিডের গল্প শুনতে শুনতে আমার মুখে অস্ফুট হাসি ফুটে উঠেছিল। সে হাসির জাতটা হাসির দলে নয়, তা ডেভিডের চোখের জলের তুল্য। ডেভিড সে হাসির অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই গল্প বলতে বলতে, গল্পের এমন একটা জায়গায় আমার মুখে হাসি দেখে বোধহয় সে অত্যন্ত আহত হয়েছিল। তা না হলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে কেন—আপনি হাসছেন স্যার?

আমি হেসেই বলেছিলাম—না ডেভিড, হাসিনি!

চেষ্টা করে গিয়ে হাসতে পারিনি, চোখে জল এসে পড়েছিল। হাত বাড়াতে হয়েছিল চোখের প্রান্তের অশ্রুবিন্দু মুছবার জন্যে।

নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

রাজার কঠিন নিমন্ত্রণে এখানে আসবার মুহূর্তে বৃদ্ধা মায়ের চোখের জলে-ভাসা, জীর্ণ, বহু রেখায় রেখাঙ্কিত, আকুল মুখের ছবিখানা মনে ভেসে উঠল। ডেভিড নিজের মায়ের কথা বলতে গিয়ে আমার মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে।

মায়ের মুখখানাই এখন ভাববার চেষ্টা করছি। কৈ, কি আশ্চর্য, মায়ের সেই আকুল, জীর্ণ মুখখানা আর মনে আসছে না! তার বদলে, অনেক অনেকদিন আগে, আমি যখন ছোট ছিলাম, মা যখন তরুণ ছিলেন, সেই বিস্মৃত বাল্য-দিবসের একটি ছবি আমার চোখে ফুটে উঠল। তরুণ সুন্দর মুখ, মসৃণ ললাট, চোখে কপট ক্রোধ, কিন্তু তার আড়ালে অপরিসীম কৌতুক-হাস্য ক্রোধকেই যেন এক অপরূপ মূর্তি দিয়েছে।

আজ দেখছি আমি আমার মনের আর্ট গ্যালারিতে মায়ের সেই ছবিখানিই টাঙিয়ে রেখেছি।

ডেভিডও কি ভিন্ন কিছু করেছে? না তো! সেও আমার মত একই পথের যাত্রী!

মায়ের যে ছবি ডেভিড সেদিন আঁকতে পারেনি, সে ছবি,—ডেভিড জানে না, কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পারছি—সম্পূর্ণ করে, অপরূপ করে কবে নিজের মনের মধ্যে আর্ট গ্যালারিতে মহা-সমাদরে সজ্জিত করে রেখেছে। সে ছবি যদি রাফায়েল, বত্তিচেল্লীর ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে তা কোন অংশে খাটো হবে না একথা জোর করেই বোধ হয় বলতে পারি।

হঠাৎ ডেভিড বললে—আপনি শুনছেন না স্যার!

আমি অন্যমনস্ক হয়ে যে ওর কথাই ভাবছিলাম ওর কথা না শুনে, সেটা আর বলা হল না। লক্ষ্য করলাম—বলতে বলতে ও থেমে গিয়েছে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—বল ডেভিড, বল!

ডেভিড আবার বলতে লাগল যেখানে ছেড়েছিল সেইখান থেকে।

মা ছবিখানা নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

আমি মাকে আটকালাম—ছবিটা নিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?

—বললাম তো বাঁধতে দিতে।

আমি আবার কেঁদে বললাম—না।

মা মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে। বললে—আচ্ছা, বাঁধতে দেব না, জনিকে একবার দেখিয়ে বাক্সে রেখে দেব।

আমি মাথা নেড়ে জোর করে বললাম– না, ওটা বাবাকে তুমি দেখাতে পারবে না।

মা সকরুণ বেদনার সঙ্গে বললে—ছি, জনিকে না দেখালে চলে ? ও তোমার বাবা ! না দেখালে দুঃখ পাবে জনি।

দেখলাম মায়ের চোখ ছলছল করছে। আমি মনে মনে বড় লজ্জা পেলাম। বললাম—বেশ, তাই ক'রো।

মায়ের ছলছল চোখের ভিতর থেকে হাসির চিকিমিকি চমকে উঠল। ঠোঁটের আবছা হাসি ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে। মা বললে—তার চেয়ে এক কাজ কর ! ছবিটায় জনির নাম লিখে আজকের দিনে উপহার দে জনিকে। সেই সবচেয়ে ভাল হবে।

কথাটা তো আমারও মনে ছিল। কেবল ছবিখানা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু আমার ভেবে অত্যন্ত অবাক লাগল যে মা ঠিক আমার মনের কথাটা ধরতে পেরেছে। কিন্তু কি করে মা পারল ?

ডেভিডের জীবনে সে রাত্রিটি একটি স্মরণীয় রাত্রি।

জীবনের নানান পর্যায়ে এই রাত্রিটির স্মৃতি নানানভাবে তার মনে বার বার ফিরে এসেছে।

বিচিত্র সে রাত্রি ডেভিডের জীবনে।

সন্ধ্যার মুখে বাবা ফিরে এলেন নানান জিনিসপত্র নিয়ে। তার জন্মদিন উপলক্ষ করে।

দুটো মাত্র ঘর। দুখানাই উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। শোবার ঘরে খাটের পাশে টিপয়ের ওপর ফ্লাওয়ার ভাসে ফুলের গোছা। তার ছোট্ট ঘরে ফুলের তোড়া, পর্দার এ পাশে খাবার টেবিলে ভাসে ফুল। কত ফুল সেদিন বাবা এনেছিল !

খাবার টেবিলে দুপাশে হাসি-হাসি মুখে বাবা আর মা ! মাঝখানে

ভাল জামা-কাপড় পরে ডেভিড। খাবার টেবিলে মস্ত বড় বার্থ-ডে কেক। তার উপরে বসানো এগারটা ছোট ছোট মোমবাতি।

মা বললে, মায়ের মুখে যত হাসি তত কৌতুক,—নাও, এবার আরম্ভ কর জনি।

বাবা হেসে দেশলাই বের করে মোমবাতিগুলি জ্বালিয়ে দিলে।

এগারটি মোমবতির তরুণ শিখা মৃদু চঞ্চলতায় একসঙ্গে কাঁপতে লাগল। যেন আলোগুলি সব নাচের তালে তালে দুলছে।

বাবা তার পিঠে হাত দিয়ে বললে—নাও, এবার এক ফুঁয়ে বাতিগুলো সব নিবিয়ে দাও। কি, দিতে পারবে তো? ভুল হবে না?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড ঘাড় দুলিয়ে ঝুঁকে আলোগুলোর উপরে মুখের দমকা ফুঁ দিয়ে যেন আলোগুলোকে দমকা আচমকা ধমক দিয়ে নিভিয়ে দিল। একটাও বাকী রইল না।

বাবা মা দুজনেই খুশী হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল—গুড, ভেরি গুড, গ্যাটস্ ইট। নাউ, হ্যাপি, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, আওয়ার সন।

তারপর কেক কাটলে সে। কি সুন্দর, আর কত বড় কেক!

তারপর ভোজন।

সে রাত্রিতে ডিনারে প্রায় ছ'টা কোর্স। সব ব্যবস্থা করেছিল বাবা আর মা দুজনে।

খাওয়ার পর মা তাকে চোখে চোখে ইঙ্গিত করতেই সে হাসিমুখে মায়ের ছবিখানা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

বাবা অবাক হয়ে বললে—What's that son?

ও কিছু বলবার আগে মা বললে—Just take it and see. তুমিই নিজে দেখ না!

হাত বাড়িয়ে ছবিখানা নিয়ে বাবা দেখলে। তার মুখে যেন অনন্ত বিস্ময়।

—বাঃ, চমৎকার!

ডেভিডের মনটা চমৎকার আনন্দে ভরে উঠল। সে হাসিমুখে বাবার সোৎসাহ কথাগুলো স্ফূর্তির অট্টহাস্য বলে গ্রহণ করলে।

বাবা বললে—আমি আজ ডেভিড সম্পর্কে বলছি, **he will be a great artist someday, I am sure.**

ডেভিডের জন্মদিনে বাবার সেই কথাগুলি সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হয়ে রইল।

বাবা ডেভিডকে খাবার টেবিল থেকে কোলে তুলে নিলেন।

ডেভিড বড় হয়েছে। বাবার কোলে তার কেমন লজ্জা লাগছে! সে কোলের মধ্যে ছটফট করতে লাগল। বাবা হেসে বললে—অত লজ্জা পেতে হবে না! তুই যে আমার ছেলে। তোর কি ধারণা তুই খুব বড় হয়েছিস। বলে বাবা তাকে কোলের ভিতর নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরলে।

সে হঠাৎ বললে—কিন্তু তোমার শরীর হাত এত গরম কেন ড্যাডি?

—ও কিছু নয়! এমনি গরম হয়েছে।

তার মা টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে অকস্মাৎ এপাশে সরে এসে উৎকুণ্ঠিত মুখে বাবার কপালে, জামার ভিতরে বুকে হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করবার চেষ্টা করলে। তার চোখের সামনে মায়ের মুখের হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। গভীর উৎকণ্ঠা ছেয়ে ফেললে তার মুখখানা। ডেভিড অবাক হয়ে গেল দেখে যে তার জন্মদিনের আনন্দ কোথায় এলোমেলো মেঘের মত উড়ে চলে গেল।

মা যেন তার কথাও ভুলে গেল। বাবার হাত ধরে বললে—চল শোবে চল।

বাবা প্রতিবাদ করলে না।

মা জিজ্ঞাসা করলে—কখন থেকে জ্বর হল তোমার?

—ঠিক জানি না! তবে দুপুর থেকে শরীরটা খারাপ করছিল!

—আমাকে এতক্ষণ বলনি কেন?

বাবা হাসল। বললে—তা হলে বেচারা ডেভিডের জন্মদিনে আনন্দটা মাটি হয়ে যেত।

মা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

—ওর জন্মদিনের আনন্দটা নষ্ট হবে বলে তুমি জ্বরগায়ে বসে থাকলে এতক্ষণ? ওর জন্মদিনে অন্যদিন আনন্দ করতাম!

মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ডেভিডের মনে হল—মা কি ছিঁচকাঁদুনে!

মা যেন তারপর তার কথা ভুলেই গেল। মা পড়ল বাবাকে নিয়ে।

সকাল বেলা, তখনও তার ওঠার সময় হয়নি। মা তাকে ধাক্কা দিয়ে

ডেকে বললে—ডেভিড, ওঠ, এখুনি 'ডকে'র কাছে যাও। সঙ্গে করে নিয়ে এস তাঁকে। বলবে বাবার খুব অসুখ।

নূতন বৎসরারম্ভের প্রথম দিনে ঘুম-ভাঙা চোখে সে দেখলে তার মায়ের মুখে হাসি নেই, চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় একটা ভয়ের মুখোস কে যেন পরিয়ে দিয়েছে মায়ের মুখে। মুখটা শুকনো, দুই চোখ ত্রাসে স্বল্প বিস্ফারিত, মুখের উপর পরিচ্ছন্ন সজ্জার চিহ্নমাত্র নাই।

মা যেন সেই ভয়ের মুখোস তার মুখেও পরিয়ে দিলে। তারই তাড়নায় সে ছুটে চলে গেল ডাক্তারের কাছে।

গোটা বাড়িতে একটা কিসের ছায়া! নিদারুণ ভয়ে যেন সব হাসি, সব কথা থেমে গিয়েছে! বাবার খুব অসুখ!

বাবার অসুখ বলে সে এখন ইস্কুলে যায় না। বাড়িতেই সর্বক্ষণ থাকতে হয় তাকে। কিন্তু বাড়িতে থাকতেও মন চায় না। একটা আড়ষ্টতা তার মনে, আর একটা কি যেন গোটা বাড়িতে কোথায় নেপথ্যে ওৎ পেতে আছে। যেন কোন ভয়ঙ্কর চতুষ্পদের মত সুযোগ পাবা মাত্র লাফিয়ে পড়বে।

সেই অজানিত আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা সব সময় কেমন ধড়ফড় করে।

একদিন দুপুর বেলা সেই অজানিতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গিয়ে উঠল চার্চে।

সেই বিশাল প্রকাণ্ড ঘরে আবছা অন্ধকার আর অপরিমেয় নিস্তব্ধতা নিথর হয়ে আছে। তার ছোট্ট পায়ের নরম শব্দও তার নিজের কানে অনেকখানি হয়ে বেজে উঠল।

সে আস্তে আস্তে বসল হাঁটু গেড়ে। চোখ বন্ধ করে বাবার জন্য প্রার্থনা করবে সে।

চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে থাকতে তার হঠাৎ মনে হল কে যেন তার কাঁধের উপর আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নিলে এ কার কাজ। এ সেই ভয়ঙ্কর যে তাদের বাড়িতে লাফিয়ে পড়বার জন্যে নেপথ্যে অপেক্ষা করছিল। সে তার সঙ্গ ছাড়েনি। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এই গির্জার ভিতর পর্যন্ত। এসে তার অলক্ষ্যে নিশ্চয় তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে চমকে লাফিয়ে উঠল। কই নেই তো! কিন্তু গেল কোথায়? তা হলে এই ঘরের অন্ধকারে সে মিশিয়ে গেল। সে আছে এইখানেই, তার চারিপাশে, তার অলক্ষে।

সেই ভয়ঙ্করের দ্বারা চারিপাশে বেষ্টিত হয়ে সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। এখন কি করে সে বাইরে যাবে? সে চারিপাশে তাকাতে লাগল।

ঐ তো আলো। ওখানে ও নেই! ঐ তো অনেক উঁচুতে প্যানেলে আঁকা যিসাসের মুখের দু পাশ দিয়ে আলোর তীর ছুটে আসছে ওকেই তাড়া করে।

ভয় নাই!

মাথার উপরে যিসাস রয়েছেন যে!

সে আস্তে আস্তে গির্জা থেকে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে শান্ত চিত্তে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু যখন বাড়ি এল তখন বুঝলে সেই শয়তানটা তাকে ছেড়ে এসে এখানে লাফিয়ে পড়েছে। মা কাঁদছে!

মা কাঁদছে কেন? তা হলে—

তাকে দেখে মা হা হা করে কেঁদে উঠল—কোথায় গিয়েছিলি? জনি য় তোকে না দেখে চলে গেল।

কি ঘটেছে তাও সে ঠিক বুঝল না, তবু মায়ের কান্না দেখে সেও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চোখের জলের ভিতর দিয়ে দেখলে বাবা চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তা হলে? এ ঘুম থেকে বাবা আর কোন দিন জাগবে না?

ভাবতেই তার কান্না ঠেলে ঠেলে বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু বেশী কান্নার সময় সে পেল কোথায়? তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ছোট্ট ঘর দুখানা লোকে ভর্তি হয়ে গেল। ফাদার নর্টন, বাবার ইস্কুলের মাস্টাররা, উঁচু ক্লাসের অনেক ছেলে এসে বাড়ি ভর্তি করে ফেললে। কফিন এল, অনেক ফুল এল। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ফাদার নর্টন বাইবেল খুলে কি সব বললেন। আস্তে আস্তে বাবাকে বিছানা থেকে কফিনের মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হল।

তারপর শোকযাত্রা!

তার মায়ের হাত ধরে সে ফাদার নর্টনের পাশে পাশে চলেছে। সঙ্গে চলেছেন ইস্কুলের টিচাররা, তার পিছনে স্কুলের সব ছেলেরা! তার মনে হল এত লোক অথচ এতটুকু শব্দ নেই, কেবল পায়ের শব্দ উঠছে।

তা হলে সেই ভয়ঙ্কর এখনও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে?

কিন্তু সে নিজে তো তা অনুভব করছে না। না, কোন ভয় নেই তার!

মাও কি ভয় পেয়েছে?

সে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মা চলেছে ফাদার নটনের কাঁধে ভর দিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঠকঠক করে মায়ের সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মা তো ভয় পেয়েছে তাহলে!

সে একবার মৃদু স্বরে ডাকলে—মামি!

মা শুনতে পেলে না।

সে আবার ডাকলে—মামি!

এবার ফাদার নর্টন তার দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলেন।

সে চুপ করে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে লাগল—তা হলে সেই ভয়ঙ্কর এক তাকে ছাড়া সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে!

গ্রেভ ইয়ার্ডে ফাদার নর্টন বাইবেল খুলে সার্ভিস ও প্রার্থনা করলেন। তার মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অন্য সকলে মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাবাকে নিয়ে কফিনটা নীচে নেমে চলে গেল। মৃত বাবা তার চোখের আড়াল হয়ে গেল চিরকালের জন্য।

এতক্ষণে ব্যাপারটা তার উপলব্ধি হল। ভয়ঙ্কর নয়, ভয় নয়। একটা মর্মান্তিক হাহাকার তার বুকের ভিতর থেকে সোচ্চারে বেরিয়ে আসতে কেঁদে উঠে সকলের হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে গেল কবরের উপর।

ফাদার নর্টন তার হাত চেপে ধরলেন। তার পর সস্নেহে তাকে কোলে টেনে নিয়ে পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বাবার প্রতি প্রীতি-প্রসন্ন ও সশ্রদ্ধ এতগুলি সম্ভ্রমে নতশির মানুষের সামনে বাবার জন্য শোক প্রকাশ করতেও তার সে যে কি ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল তার এই বেদনার হাহাকারটুকুতে সমবেত

সকলের সুগভীর সমর্থন আছে, এবং সবারই মন কমবেশী বাজছে একই সুরে।

ফাদার নর্টন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন সস্নেহে। তাঁর চোখও সজল হয়ে উঠেছিল।

ফাদার নর্টনই তাদের দুজনকে গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ফাদার নর্টন চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে আসল অবস্থাটা বুঝতে পারেনি। বুঝতে পেরেছিল তিনি চলে গেলে।

তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা যেন একটা বোবা রাক্ষসের মত তাদের দুজনকে এক মুহূর্তে গিলে খেয়ে ফেলেছিল। সে এক ঘরে, তার মা এক ঘরে। দুজনেই নীরব। সব কথা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে তাদের, যেন তাদের গোটা পৃথিবীটাই আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে উঠেছে এক মুহূর্তে।

সেই নীরবতা চলল তো চললই, ছেদহীন হয়ে চলল।

ক'দিন চুপচাপ করে সে বসে রইল বাড়িতে। কোন কিছু করতে ইচ্ছা হয় না, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। শুধু বাবার কথা ভাবতে, বাবার কথা ভেবে চোখের জল ফেলতে ভাল লাগে।

এই অবস্থায় মা আবার অফিস যেতে আরম্ভ করলে।

কয়েক দিন পর অফিস থেকে ফিরে সে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলে বাবার একখানা হাসি-হাসি মুখের ছবি!

সে ছুটে এসে দাঁড়াল ছবির সামনে। মায়ের হাত ধরে গাঢ় স্নেহে সে জিজ্ঞাসা করলে—মা, তুমি ছবিতে দেবার জন্যে ফুল আন নি? আনতে হত। তা আমাকে পয়সা দাও, আমি মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে ফুল কিনে নিয়ে আসি।

মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল ফুল কিনতে।

বহুদিন পর সেই দিন সে আবার পথে বেরুল।

বাবার মৃত্যু তার অস্তিত্বের যে মূলোচ্ছেদ করেছিল বাবার ছবি আবার সেই ছিন্নমূলে রস সিঞ্চন করে তার অস্তিত্বের নবীন অঙ্কুর উদগত করে দিলে।

মমতার নূতন রস সিঞ্চন করলেন আরও একজন। ফাদার নর্টন।

আবার যেদিন সে ইস্কুলে গেল সেদিন প্রথম ঘণ্টাতেই তাকে ডেকে পাঠালেন ফাদার নর্টন।

তাঁর ঘরে যেতেই ফাদার নর্টন সস্নেহে বললেন—তুমি ইস্কুলে এসেছ আজ? ওয়েল, টেক ইওর সীট, ডেভিড, মাই সন। বস।

তারপর তার কাছে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন—আমার ক'দিনই মনে হচ্ছিল তোমাকে ডেকে পাঠাই স্কুলে। কিন্তু তারপরই মনে হয়েছে—আচ্ছা, এত তাড়া কিসের? ওর মনটা শান্ত হোক, ও নিজেই আসুক। তা তুমি আজ এসেছ, খুব ভাল হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—জনকে আমি আমার ছেলের মতই ভালবাসতাম। তুমি জনের একমাত্র ছেলে। তোমার মধ্যে আর্টিস্ট হবার শক্তি আছে। আমি তোমাকে দেখতে চাই তুমি আর্টিস্ট হয়েছ। কাজেই তোমার লেখাপড়ার শেষ পর্যন্ত কোন ভাবনা নেই; তার সব ভাবনা আমার। তোমার মাকে ব'লো যেন সে তোমার লেখা-পড়ার জন্যে এতটুকু না ভাবে। কেমন? টেল হার! দ্যাট্‌স্ অলরাইট্।

তারপর বললেন—ওয়ান থিং মোর! আর একটা কথা! খারাপ ছেলেদের সঙ্গে খবরদার মিশবে না! মিশলে কি ক্ষতি হবে জান? জান না তুমি। যদি মেশ তা হলে চরিত্র এবং শক্তি দুই-ই নষ্ট হয়ে যাবে। দুটোই সমান মূল্যবান। এই কথাটা মনে রেখো! নাউ, ইউ ক্যান গো, যাও।

সে ঘর থেকে চলে আসছে এমন সময় ফাদার নর্টন বললেন—যেও না, একটু দাঁড়াও, মাই সন!

বলে পিছনের শেল্‌ফ থেকে একখানা বই নিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন—তোমার জন্যে রেখেছিলাম, নিয়ে যাও।

বইখানা হাতে নিয়ে সে তাকাল ফাদারের মুখের দিকে।

বইখানার নাম—দি ম্যাডোনা ইন পিকচার্স।

বাড়ি এসে বইখানা সে দেখল। পাতায় পাতায় মা আর ছেলের ছবি। ঈশ্বরপুত্র আর তাঁর মা। শিল্পীদের নাম—মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল, বতিচেল্লি, আরও কত।

মা অফিস থেকে ফিরবার আগেই সে ইস্কুল থেকে ফিরে এসেছে সেদিনও, যেমন আগে আগে আসত। এবং এসে অধীর আগ্রহে মায়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। ঘর পরিষ্কার করে, টেবিল গুছিয়ে, উনুন

ধরিয়ে চায়ের জন্য জল বসিয়ে রাখত। টেবিলের উপর পাঁউরুটি ঢাকা দিয়ে রেখে দিত।

সেদিন ছবির বইখানা নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে মা কখন এসেছে তা খেয়ালও করেনি সে। কাজ কর্ম সব ঠিক ঠিক করে জানলার কাছে মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে বইয়ে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

—কি দেখছ ডেভিড?

—ম্যাডোনার ছবি মামি! ফাদার নর্টন আজ দিয়েছেন। তিনি আমাকে আজ কি বললেন জান? তিনি বললেন—বলে এক নিঃশ্বাসে সব কথাগুলো বলে ফেললে সে মাকে। বলে মায়ের মুখের দিকে হাসি-মুখে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ তার মনে হল—মায়ের মুখখানা কি সুন্দর! এখানে বইয়ে মস্ত মূল্যবান আসনে কত আভরণ-ভূষিতা মা বসে আছেন, মুখ লাবণ্যে ঢলঢল, কত তৃপ্তি মুখে! আর তার সামনে তার মায়ের মুখখানি সারা-দিনের পরিশ্রমে শুকিয়ে গিয়েছে। ক্লিষ্ট ক্লান্ত মুখ! কিন্তু তার মুখের দিয়ে চেয়ে মা এই যে হাসছে এ যেন আরও সুন্দর। সে অকস্মাৎ গভীর আবেগে মায়ের একখানা হাত নিজের দুই হাতে চেপে ধরে বললে—আমি বড় হয়ে তোমার একখানা ছবি আঁকব মা! এই এমনি ম্যাডোনার ছবি। এর চেয়ে অনেক ভাল।

মা ক্লিষ্ট মুখে শুধু একটু হাসল। তারপর বললে—**That's very good of Father Norton.**

মায়ের মুখ দেখে তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। এ হাসি যেন কান্নার চেয়ে মর্মান্তিক! সে বললে—তোমার মুখটি শুকিয়ে গিয়েছে। তুমি খুব ক্লান্ত হয়েছ, নয় মা? তোমাকে অফিসে খুব খাটায়, না?

এবার মা সত্যিই হাসল। নিজের কষ্ট ও ক্লান্তি ঢাকবার হাসি এ নয়। সহজ স্বাভাবিক হাসি। হেসে মা বললে—তা খাটায় বৈকি? না খাটিয়ে কি কেউ কাউকে মাইনে দেয়?

—তুমি চাকরী ছেড়ে দাও না!

—চাকরী ছেড়ে দিলে কি খাব, তোকে কি খাওয়াব?

এবার চুপ করে যেতে হল ডেভিডকে। সত্যি, এর তো কোন উত্তর নেই।

—এখন আমার এনগেজমেণ্ট আছে! গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে।

—তা তুই যা!

—তুইও আয় না। কেবল বই নিয়ে থাকলে কিছু হয়? সি সামথিং অব লাইফ! জীবনও দেখ সঙ্গে সঙ্গে।

—তুই দেখ। আমি বাড়ি যাই। বলে সে ডিকের দিকে তাকাল। ডিক তার চেয়ে কিছু বড় বয়সে। কিন্তু ডিকি এরই মধ্যে কত লম্বা হয়ে গিয়েছে! এক কথায় অন্য রকম হয়ে গিয়েছে ডিকি!

ডিকি জিজ্ঞাসা করলে হেসে—কি দেখছিস?

—তোকে। তুই কত বড় হয়ে গিয়েছিস। তুই প্রায় বেটাছেলে হয়ে গিয়েছিস। A man.

—**So I want a girl friend,** তাই আমার একজন বান্ধবী চাই আর আমি পেয়েও গিয়েছি একজন।

—ভাল। তুই যা।

—তুইও আয়, আলাপ করিয়ে দোব তোর সঙ্গে।

ডেভিড দৃঢ় স্বরে বললে—না।

বলে সে চলতে লাগল। ডিকি ভ্রূক্ষেপও করলে না। সে শিস দিতে দিতে সাইকেলে উঠল।

সেও বই হাতে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এল।

দু জনের দুটো ভিন্ন জগৎ। তাদের ভূগোলই শুধু পৃথক নয়, ডিকির জগতের ছায়াও তার জগতে পড়ে না।

বড় আনন্দে কেটেছিল কৈশোরের সেই দিনগুলি।

এক সময় ছিল বাবা, মা আর সে। তারপর সে আর মা। তার সমস্ত কিছুকে যেন ঘিরে রেখেছিল তার মা। সে অনুভব করত মায়ের সমস্ত চিন্তা ও চেতনার মধ্যে শুধু তাকে প্রতিষ্ঠা করেই মা বেঁচে আছে।

কিন্তু এক সময় তার এই অনুভবে চিড় খেয়ে গেল।

একদিন বিকেল বেলা, ইস্কুল থেকে যথা নিয়মে এসে জানলার ধারে বসে মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু মা আর আসে না! রৌদ্রের রঙ বদল হয়ে গেল। হলদে রোদ কমলা রঙ হয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু মায়ের দেখা নেই। উদ্বেগে তার বুকের ভিতরটায় কি হতে লাগল যেন!

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন দুই ভ্রূ আর চোখে ব্যথা করতে লাগল, তবু মা এল না, তখন সে রাস্তায় নেমে এসে দাঁড়াল।

রাস্তা দিয়ে পাড়ার ডিকির মত ছেলেরা সাইকেলে একজন করে বান্ধবীকে বসিয়ে নিয়ে চলে গেল দল বেঁধে, তাকে দেখে ব্যঙ্গ করে দু একটা মন্তব্যও ছুঁড়ে দিয়ে গেল। তার কানে কথাগুলো এসে পৌঁছুলেও মনে পৌঁছুল না! সে উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করতে লাগল রাস্তায়।

তারপর যখন রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলে উঠল তখন সেই গ্যাসের আলোয় নজর পড়ল দূর থেকে—ট্রাম থেকে মা নামছে।

তার ইচ্ছা হল ছুটে যায় মায়ের কাছে, গিয়ে মায়ের হাতখানা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমাকে ছেড়ে তোমার মন খারাপ করছিল না?

কিন্তু মাকে চমকে দেবে বলে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

একটা গ্যাসের আলো থেকে মা আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আর ঠিক দেখা যাচ্ছে না মাকে ভাল করে। আবার একটা গ্যাসের আলো মুখে পড়তেই মায়ের মুখখানা ভাল করে সে আবার দেখতে পেলে। আশ্চর্য, মা আজ এত দেরী করে ফিরছে, অথচ মুখখানায় আজ ক্লান্তির চিহ্ন নেই, ক্লেশের যে ভারটা মা সব সময় বয়ে বেড়ায় বলে মনে হয় সে ভারটা যেন মা কোথায় আজ নামিয়ে রেখে এসেছে। মাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে আজ!

সে আর থাকতে পারলে না। ছুটে গিয়ে মায়ের হাতখানা চেপে ধরলে—মামি!

মা যেন চমকে গেল।

সে অবাক হয়ে দেখলে যেন কোন মন্ত্রবলে সমস্ত ক্লেশ আর ক্লান্তির বোঝা আবার মায়ের মুখে এসে চেপে বসেছে।

সে অভিমান করে বললে—তুমি এত দেরী করলে কেন মামি? আমি সেই কঁখন থেকে তোমার জন্যে বসে আছি, অপেক্ষা করছি! চায়ের জল সব ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল!

মা একবার যেন ইতস্তত করলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে—কি করব? অফিসে গিয়ে দেখি বড় সায়েবের ছেলে পরীক্ষায় পাশ করেছে ভাল করে, তাই তিনি অফিসে টাকা দিয়েছেন পার্টির জন্যে। কি

করি? বাধ্য হয়ে থেকে যেতে হল। আর আসতে পারলাম না! চল উপরে চল!

চায়ের টেবিলে মা আস্তে আস্তে ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্য থেকে দু' টুকরো প্যাসট্রি বের করে তার প্লেটের উপর রেখে বললে—খা! খাবার টেবিল থেকে তোর জন্যে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম!

সে প্যাসট্রির একটিতে কামড় দিয়ে প্রসন্ন মনে বললে—চমৎকার!

মা শুধু হাসল।

কিন্তু মুস্কিল হল এর পর।

এর পর থেকেই মাঝে মাঝে সপ্তাহে এক দু'দিন মায়ের আসতে দেরী হতে লাগল। সে যথারীতি ইস্কুল থেকে আসে, পবিত্র কর্তব্যের মত বাবার ছবির কাছে এসে দাঁড়ায়, অন্যান্য যে সব কাজ আছে সে সবও চটপট সেরে ফেলে জানলার ধারে চেয়ারে বসে মায়ের অপেক্ষা করে। কিন্তু তার প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দিয়ে মা ফেরে না। সে যখন অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, যখন বিরক্তিও আর থাকে না মনে, যখন অভিমান ও ভরসা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, শুধু মনে বিরাজ করে ক্লান্তি, ক্লান্তিতে যখন ঘুম আসে তখন মা ফিরে আসে।

মায়ের শরীর ইদানীং আবার ভাল হয়েছে। মায়ের মুখের ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। মায়ের মুখে একটি সংগোপন হাসি আজকাল সব সময় খেলা করে।

মা সেই হাসি মুখে এসেই তার কাছে দাঁড়ায়, তার পড়ে-যাওয়া বইখানা তার হাতে তুলে দেয়, তারপর মুখের সহজ প্রসন্নতাকে কপট বিষণ্ণতার রঙ মাখিয়ে ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—আমার ওপর রাগ করেছিস?

ডেভিড আগে আগে অভিমান ক'রে, রেগে, মায়ের হাতখানা সরিয়ে দিত। আজকাল আর দেয় না। আজকাল সে শুধু মায়ের মুখের দিকে শূন্য বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জানে, মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এখুনি নানান মিথ্যে কৈফিয়ৎ দেবে।

মা তাই দেয়ও।

কোনদিন বলে—পার্টি ছিল, কোনদিন কোন বন্ধুর নাম করে বলে—সে ছাড়লে না, জোর করে তার বাড়ি নিয়ে গেল।

কিন্তু ডেভিড জানে মা মিথ্যা কথা বলছে। শুধু তাই নয়, সে আস্তে

আস্তে বুঝতে পেরেছে এই ধারাবাহিক মিথ্যার পিছনে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণাকর সত্য তার জন্য অপেক্ষা করছে।

সে সত্য অবশেষে একদিন আবছা প্রকাশও পেল। প্রকাশ পেল মিঃ এণ্ড্রু গোমেজের মধ্য দিয়ে।

সেদিন বিকেলবেলা। মা তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছে। চা খাওয়ার পর দুজনে পরমানন্দে গল্প করছিল, এমন সময় দরজায় নক। টক টক, টক টক।

মা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু মা উঠবার আগেই সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

আর দরজা খুলতেই দেখতে পেলে এক বিচিত্র মনুষ্য-মূর্তি! এত লম্বা যে প্রায় আকাশ দেখার মত মুখ উঁচু করে তাকে দেখতে হয়। মানুষটা যত লম্বা তত বিশাল-দেহ, অথচ দেহে কোথাও মেদের এতটুকু বাহুল্য নেই। গায়ের রঙ একসময় ফর্সা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গিয়েছে। বড় বড় চোখ, তার চেয়েও বড় মাপের বেখাপ্পা নাক। তার নীচে মস্ত বড়, প্রকাণ্ড, মোম-দিয়ে-মাজা একজোড়া গোঁফ। গায়ে ওপন-ব্রেস্ট কোট। সব মিলিয়ে লোকটার মধ্যে একটা আশ্চর্য স্থূলতা আর কর্কশতা যেন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে।

নিজের অজ্ঞাতেই ডেভিড মানুষটার সঙ্গে নিজের বাবার একবার তুলনা করে নিলে। মুহূর্তেক সময় মাত্র। তার বাবা ছিল মাঝারি আকারের মানুষ, কাঁচ কাঁচ রঙ, ময়লার ধার ঘেঁষেই যায়। কিন্তু মুখে ছিল অতি সুদুর্লভ কোমলতা। তার উপরে লাবণ্যের দীপ্তির মত বাবার মুখে সব সময় লেগে থাকত মৃদু হাসি, যা প্রায় মনে হত অর্থহীন। সেই হাসিতেই বাবাকে আশ্চর্য সুন্দর ও সুকুমার মনে হত।

এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই সেই প্রকাণ্ড লম্বা মানুষটি কথা বললে—তুমি বুঝি মাস্টার রোজারিও?

—হ্যাঁ!

—মিসেস রোজারিও আছেন বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

তার কাঁধে বাঘের থাবার মত প্রকাণ্ড একখানা হাত রেখে লোকটি বললে—তোমার মাকে বল মিঃ এণ্ড্রু গোমেজ এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

বলে কিন্তু কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাকে যেন ঠেলে নিয়ে মানুষটি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল !

ডেভিডের মনে হল—কি অভদ্র লোকটা ! জোর করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল ?

ডেভিড মনে মনে ভাবতে লাগল কি একটা আপত্তিকর কথা জুৎসই করে বলা যায় যাতে তার মনের বিরাগ এবং এই অভব্যতার সমালোচনা দুইই একসঙ্গে হয়।

কিন্তু লোকটি ভ্রূক্ষেপও করলে না তার জন্যে। সে যে আদৌ আছে সে কথাটাও যেন একেবারে ভুলে গিয়েছে লোকটা। সামনেই তার মাকে দেখতে পেয়ে সে নিজের লালচে, অদ্ভুত মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে তুলে বললে—হিয়ার ইউ আর অ্যানি! এই তো তুমি রয়েছ !

সে মায়ের দিকে তাকাল।

মা লোকটার গলার আওয়াজ পেয়ে আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখেই মায়ের মুখের চেহারাটা যেন কেমন বদলে গেল। কেমন যেন লজ্জায় মাযের মুখে একটা লাল রঙের ছোপ লাগল। ঐ প্রকাণ্ড বিদঘুটে চেহারার মানুষটার মুখের দিকে চেয়েই যেন লজ্জার ভারে অল্পবয়সী মেয়ের চোখের মত মায়ের চোখের পাতা নুইয়ে পড়ল মাটির দিকে।

খুব খারাপ লাগল ডেভিডের। মা মানুষটাকে দেখে অত লজ্জা পাচ্ছে কেন? কেন মা অমন মুখ নামিয়ে চুপ করে আছে? কেন সহজ হয়ে কথা বলতে পারছে না? কেন?

মা তো কই অন্য কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অমন লজ্জা পায় না, অমন নিরুত্তর হযে মাটির দিকে চোখও নামায় না! সে তো দেখেছে মাকে ফাদার নটন, তার ড্রইং মাস্ট্রার মিঃ ম্যাট্রিক নোরানার সঙ্গে কথা বলতে।

মা মৃদু কণ্ঠে বললে—তুমি হঠাৎ এলে যে ?

এত মৃদু কণ্ঠে মা কথা ক'টি বললে যে সে ভাল করে শুনতেও পেলে না। তার মনে হল যাতে সে শুনতে না পায় এই জন্যেই অত আস্তে কথাগুলি বললে মা।

লোকটি অত্যন্ত আবেগতপ্ত ভাবে বললে—হঠাৎই এলাম। না এসে

উপায় ছিল না। **I just couldn't help it. So I came.** আর থাকতে পারলাম না, তাই চলে এলাম।

ডেভিড ভেবেছিল লোকটির এই নিরর্থক হৃদ্যতার কথায় মা রেগে উঠবে। কিন্তু সে লক্ষ্য করলে, অত্যন্ত বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলে, মায়ের মুখের লজ্জার সঙ্গে কোন এক কৌতুকের ছোঁয়াচ লাগল। তার মা ভদ্রলোকের মুখের দিকে কি আশ্চর্য অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে! ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে একটা চোখ একটু ছোট ও কুঞ্চিত করে বিচিত্র জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লোকটির মুখের দিকে।

ডেভিড ভেবেই পেলে না কি এমন সূক্ষ্ম কৌতুকের ব্যাপার লেখা আছে লোকটির মুখে যা তার মায়ের ভিতর থেকে লোকটির প্রতি এই আশ্চর্য কৌতুক টেনে বের করছে।

কিন্তু এটা তার মোটেই ভাল লাগল না।

সে তাদের বাধা দেবার জন্যই তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলে —মামি।

তার মা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বপ্নলোক থেকে সরে এল। চকিত হয়ে তার কথার জবাব দিলে—Yes! হ্যাঁ!

ডেভিড একটা অর্থহীন প্রশ্ন করলে—উনুনে যে আগুন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাত্রিতে কি রান্না করবে?

তার মা কিছু জবাব দেবার আগেই সেই লোকটি একটু কঠোর ভাবে বললে—আমাদের বিরক্ত করো না। তুমি তো যথেষ্ট বড় হয়েছ। তবে কেন কেবল মা মা করছ? যাও না, পড় গিয়ে।

তারপর এক ঝলক তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে তাকে বললে—সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। তুমি তো ইস্কুলে পড়। এখানে আমরা যেখানে কথা বলছি সেখানে তুমি কি করবে? পড়তে বস গিয়ে। এখন তোমার পড়তে বসা উচিত।

মা মানিয়ে নিলে, বললে—তুই বস। মিঃ গোমেজের সঙ্গে আমার সামান্য কথা যা আছে সেরে নিই। তারপর রাত্রির রান্না করব, কেমন?

ডেভিডের বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। এই বেখাপ্পা লোকটাকে পেয়ে তার মা তাকে সরিয়ে দিলে। তাতে এতটুকু সঙ্কোচ কি লজ্জা হল না? সে আস্তে আস্তে সরে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল।

কিন্তু বই খুলে বইয়ের দিকে সে শুধু চেয়েই রইল, একবর্ণ বুঝতে পারল না।

একটুক্ষণের কথা বলে অনেকক্ষণ মায়ের সঙ্গে ফিস ফিস করে গল্প করে লোকটি চলে গেল।

জানলার দিকে চেয়ে বসেছিল ডেভিড। মা কখন এসে আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত দিয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—লোকটা কে মা?

মা বললে—তোমার বাবার একজন বন্ধু।

—বাবার বন্ধু? কিন্তু বাবার কাছে আসতে তো কখনও দেখিনি। বাবার মুখে ওর নামও শুনিনি কখনও।

মা আর সে সম্পর্কে কোন কথা বললে না। শুধু বললে—ভদ্রলোকের নাম এণ্ড্রু গোমেজ। রেলে গার্ডের চাকরি করেন।

ডেভিড চুপ করে গেল। বুঝলে মা তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। এখন যদি আবার জিজ্ঞাসা করে লোকটা কেন এসেছিল তা হলে হয়তো মা আবার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবে, কিম্বা এমন কোন জবাব দেবে যেটা তার কাছে হবে একেবারে মিথ্যা।

ব্যাপারটা যদি এইখানেই থেমে যেত তা হলে ডেভিড কোনক্রমে সহ্য করতে পারত।

কিন্তু ব্যাপারটা সেদিন যেন মাত্র আরম্ভ হল।

তারপর থেকে এণ্ড্রু গোমেজ বিকেলের পর সন্ধ্যার মুখে প্রায়ই আসতে লাগলেন। ফলে ডেভিডের নিজের হাতে সযত্নে তৈরী করা জীবনটা এবং মনের শান্তি একটা কাচের পুতুলের মত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সে সকাল থেকে বেশ থাকে। কিন্তু যত বেলা বাড়ে তত একটা চিন্তা কালো মেঘের মত তার মনকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। ইস্কুলের ছুটির পর আর বাড়ি ফিরে আসতে ইচ্ছা করে না। পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে যত এগিয়ে আসে তত মনে হয়, শান্ত নির্জন বনভূমিতে একটা আরণ্য হস্তীর আসন্ন মত্ত পাগলামির মত সেই প্রকাণ্ড স্থূল, কর্কশ, পরুষ লোকটার তাদের বাড়িতে এসে উৎপাত করার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। একদিন যে অপরাহ্ন তার সমস্ত দিনের আনন্দের ও আশার স্থির আলোর মত জ্বলত তার মনে, তাই আজ তার কাছে একটা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়

বিভীষিকার মত হয়ে উঠেছে। আগে একটি আনন্দের সাম্রাজ্য রচনা করত বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে। এখন এসে কোন কিছু না করে সে স্বেচ্ছাবৃত বন্দীত্ব নিয়ে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকে।

মা এসে ডাকলে দরজা খুলে দেয়। আজকাল সে লক্ষ্য করেছে আর মায়ের অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয় না। মায়ের পার্টি আর থাকে না আজকাল। মা এসে জিজ্ঞাসা করে—চায়ের জল চড়িয়েছিস?

—না!

মা আর কিছু বলে না। তিরস্কার করা মায়ের চরিত্রে নেই। মা মুখ বুজে কাজ করতে চলে যায়। ক্ষিপ্রভাবে কাজকর্ম শেষ করে তাকে চা পাউরুটি এগিয়ে দেয়। সে বিনা বাক্যব্যয়ে খেয়ে আবার নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে বসে! বই খুলে বসে বটে, কিন্তু পড়া হয় না। মনে অহরহ প্রার্থনা করে—হে প্রভু, হে যিসাস, সেই মহিষের মত লোকটা যেন না আসে!

কিন্তু প্রার্থনা করেও যেন সে মনের মধ্যে জোর পায় না। একটা বিভীষিকার ছায়ামূর্তি এণ্ড্রু গোমেজের মূর্তি ধরে মনের কোথায় যেন আঁকড়ে থাকে। এবং তার কল্পনার বিভীষিকাকে সত্যে পরিণত করেই শেষ পর্যন্ত এণ্ড্রু গোমেজের আবির্ভাব ঘটে।

দরজায় 'নক' পড়ে—ঠক, ঠক, ঠক। আর আঘাতটা যেন সোজা তার বুকের মধ্যে এসে লাগে।

সে আড়ষ্টের মত বসে থাকে, মা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

এমনি ভাবে কিছুদিন যেতে যেতে একদিন গোমেজ সাহেব আর একটু এগিয়ে গেল। সেদিন মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে লোকটা অকস্মাৎ তাকে ডেকে উঠল—এ! বয়!

মুখ হেঁট করে আড়ষ্টের মত বসে থাকতে থাকতে ডাক শুনে সে চমকে উঠল।

আবার ডাক, অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠের ডাক—বয়, ডেভিড!

বাধ্য হয়ে ডেভিডকে বেরিয়ে আসতে হল। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল সে।

—কি করছিলে ঘরে বসে? যেন কৈফিয়ৎ চেয়ে বসল লোকটা।

ভীরু শান্ত ছেলের চোখে ঔদ্ধত্যের চাপা জ্বালা ফুটে উঠল। সে বললে – পড়ছিলাম।

—পড়ছিলে? আমি তোমাকে সমস্তক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেই দেখলাম। বইয়ের একটা পাতাও তুমি উলটোও নি।

সে কোন উত্তর দিলে না। কেবল তির্যক তীব্র দৃষ্টিতে গোমেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গোমেজ তা ভ্রূক্ষেপ করলে না। বললে—এ সময়ে ঘরের মধ্যে এমন ভাবে বসে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। যাও, রাস্তায় বেড়িয়ে এস। **Just have a walk.**

তার পরই বললে—তুমি **exercise** কর না কেন? তোমার এখন ব্যায়াম করা দরকার। চল আমি তোমাকে আজই এই কাছেই এক জিম্‌নাসিয়ামে ভর্তি করে দিয়ে আসি।

এক ঝলক ভেবে নিলে ডেভিড। সাধারণভাবে লোকটা যা বলবে তা না মানাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। ঠিক হয়েছে, একসারসাইজ করে গায়ে জোর করে নিয়ে তবে সে এই মহিষের মত লোকটাকে মারবে।

সে এত সহজে রাজী হবে গোমেজ সাহেব ভাবে নি। সে খুব খুশী হয়ে তার পিঠ চাপড়ে তাকে নিয়ে তখনই পরমোৎসাহে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সে এটা জানলে না, ডেভিডের মাও বুঝলে না। ডেভিডকে তারা দুজনে যেন ষড়যন্ত্র করে এই বিকালের আবাসের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করলে। সেই ক্ষত মনে নিয়েই ডেভিড তার অপরাহ্ণের স্বর্গবাস থেকে বেরিয়ে মর্তলোকের ধূলিধূসর ভূমিতে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর থেকে সে মন দিয়ে একসারসাইজ করে, বেশ খানিকটে অন্ধকার হলে ফিরে আসে।

সে দিন পথে দেখা ডিকির সঙ্গে।

তাকে দেখে ডিকি সাইকেল থেকে পা দুটো পথের মাটিতে বিচিত্র পদ্ধতিতে পায়ের আঙুল দিয়ে ঠেকিয়ে ডাকলে—হাল্লো ডেভিড! ইন সো কুয়ার ড্রেস? ওয়েন্ট টু বি এ রেসলার অর এ্যান আর্টিস্ট?

—কে? ডিকি?

—আরে তুমি কত বড় হয়ে গিয়েছ?

ডেভিড হাসলে।

ডিকি বললে—ইউ হ্যাভ্‌ চেন্‌জড্‌ এ লট্। অনেক পালটে গেছ তুমি!

কি বলবে? অর্থহীনভাবে একটু হাসল ডেভিড। অর্থহীনভাবে, শুধু কিছু বলবার জন্যই বললে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু দেখি, দেখি! বলতে বলতে সে তার ডান হাতের পাঞ্জাটা চেপে ধরলে।

দুজনের পাঞ্জা লড়া আরম্ভ হয়ে গেল। ডেভিড অবশ্য ডিকির শক্ত ভারী বড় হাতের সঙ্গে জোরে পারলে না। তবু ডিকি বললে—না, বেশ শক্ত হয়েছে তুমি! তা কোথায় চললে?

—বাড়ি!

—আমার সঙ্গে এস, বেশ খানিকটা বেড়িয়ে আসি। ইস্কুল বদল করার পর তো আর দেখা হয় না তোমার সঙ্গে।

ডেভিড হাসল।

—ছবি আঁকছ তো?

—না, এখন আর আঁকি না।

—কেন? ছেড়ো না ছবি আঁকা! আচ্ছা, এস সাইকেলে ওঠ, এই সামনে এস।

—যাঃ, ওখানে মেয়েরা বসে।

—আচ্ছা, পিছনে ওঠ তা হলে!

পিছনের চাকার ফুট পিনে পা দিয়ে সে ডিকির পিছনে দাঁড়াল সাইকেলের উপর। তার দু পাশের মানুষ গাড়ি সরে যেতে লাগল বিচিত্র গতিতে। ছুট, ছুট, ছুট। রক্তে যেন দোলা লাগে।

—কোথায় চললে ডিকি?

—তোমাকে নিয়ে কোন বাজে জায়গায় যাব না, ভয় নেই!

আবার পীচের রাস্তা, পাশের মানুষ, গাছপালা পিছিয়ে পড়ছে।

একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে ডিকি থামল মাটিতে পা ঠেকিয়ে। তাকে বললে—নাম ডেভিড! ডেভিড নামল।

চারদিকে আবছা অন্ধকার! রাস্তা প্রায় নির্জন! গ্যাসের আলো জ্বলছে কাছেই। তারই আলোয় জায়গাটায় আবছা নরম আলো। ডিকি বিচিত্র নরম সুরে বার কয়েক শিষ দিলে।

দু-এক মিনিটের মধ্যেই যেন প্রায় আশপাশের অন্ধকার ফুঁড়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ষোল-সতের বছর বয়স। চমৎকার স্বাস্থ্য; মাজা মাজা রঙ, মাথায় একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, মুখে

একমুখ হাসি। সে এসে হাসিমুখে ডিকির সাইকেলের হাতলের উপর ডিকির হাতের পাশে হাত রাখল।

—ইয়েস ডিকি।

—ইয়েস লরা।

ডেভিড এতক্ষণ মেয়েটিকে দেখছিল। মেয়েটি কিন্তু ওকে দেখেনি। ওকে দেখেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—এ কে?

ডিকি পরিচয় করিয়ে দিলে—এ ফ্রেণ্ড। ত্যাটস্ ডেভিড এণ্ড সি ইজ লরা।

লরা হাসল তার সুন্দর দাঁতের সারি বের করে। তারপর প্রশ্ন করলে—ফ্রেণ্ড?

—হ্যাঁ, বন্ধু, ব্যায়ামবীর এবং আর্টিস্ট।

—আর্টিস্ট? বলে মেয়েটি ঘাড় বাঁকিয়ে, ভ্রূ কুঁচকে, বিচিত্র কৌতুকের ভঙ্গিতে একটি চোখ ঈষৎ ছোট করে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডেভিডের বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করে উঠল। মেয়েটি তার দিকে অমন করে কেন তাকিয়ে আছে? এর অর্থ কি?

জবাব দিলে ডিকি। হেসে বললে—ইয়েস, অ্যান আর্টিস্ট।

—আর্টিস্ট? আমার ছবি আঁকতে পারবে তুমি?

বলতে বলতে নিজের পরিপুষ্ট একখানা পা সাইকেলের প্যাডেলের উপর রেখে পরম কৌতুকে দোলাতে দোলাতে তার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

হাতির দোলানো শুঁড়ের মত তার পায়ের দিকে তাকিয়ে ডেভিডের বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। এণ্ডু সায়েবের মুখের দিকে তাকানো মায়ের চোখের যে দৃষ্টির অর্থ সে বুঝতে পারেনি, লরার চোখের দৃষ্টির যে অর্থ সে এখনি মনে মনে খুঁজছিল, সেই অর্থ সে এক মুহূর্তে বুঝতে পারলে। এর অর্থ পরস্পরের স্থূল জৈব অস্তিত্বের মর্মমূলে নিহিত রয়েছে!

ডেভিডের গল্প আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে।

ডেভিড দিনে দিনে তার জীবনের খুঁটিনাটিগুলি জুগিয়েছে, তাই দিয়েই ওর কথা বলে চলেছি। যে খুঁটিনাটিগুলি ও আমাকে দিনে দিনে

দিয়েছে তার মধ্য থেকে ওর অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণ, সুকুমার মনটিকে চিনতে বিলম্ব হয়নি।

সংসারে এমন মানুষ অবশ্যই অনেক আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ছাঁচে ঢালা নয়। সংসারে প্রতিদিন যে সব মানুষ অহরহ চোখে পড়ে তারা সৃষ্টির শক্ত কঠিন উপাদানে গড়া; সংসারের প্রতিদিনের তুচ্ছতার সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচবার এবং জিতবার ধাতু দিয়ে তৈরী। তারা অনেক বেশী পরুষ, অনেক কঠোর। আবার সেই পরিমাণে কর্কশও। কিন্তু এ মানুষের ধাত আলাদা। ও যেন সৃষ্টিকর্তার কোনও কোমল মুহূর্তে কোন নরম ধাতু দিয়ে রচনা। তাতে কাঠিন্যের ভাগ কম, সরস কোমলতার ভাগ বেশী। সেই কোমলতার মধ্য থেকে ওর সহজ, সরল মনটি নিজের অপরূপ সৌকুমার্য নিয়ে পদ্মের মত মাথা তুলেছিল জলের ভিতর থেকে আকাশের আলোর দিকে। কিন্তু বোঁটায় বুঝি আঘাত লেগেছিল।

তাই দুঃখ হল অনুভব করে যে কেমন করে যেন ওর সহজ, সরল, সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি মার খেয়ে মুচড়ে যেতে আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু আমার অনুভবের কথা থাক। ওর কথাই বলি।

চার

তারপর।

তারপরের ইতিহাস দিনে দিনে ভেঙে যাওয়ার ইতিহাস। দিনে দিনে, তিলে তিলে, ভেঙে মুচড়ে, দুমড়ে সে কেমন অন্যরকম হয়ে গেল তারই কথা। তার সুকুমার, অনুভূতিপ্রবণ মনটি বাইরের ঘটনার স্থূল, পরুষ হাতের আঘাত খেয়ে, প্রতিঘাতের রাস্তা না পেয়ে নিজের মনের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আগে যেমনটি ছিল তেমনিটি আর রইল না। যা হল, তার মধ্যে আজকের ডেভিডের জন্মরহস্য নিহিত আছে।

সেই কথাই তার কাছ থেকে, আমার সংস্কৃত নাটক নিয়ে গবেষণার অবসরে দিনে দিনে শুনেছি। তাই ধীরে ধীরে বলছি।

একদিন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে মিঃ এণ্ড্রু গোমেজ তাদের সংসারে এসে অধিষ্ঠিত হলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর সে একসারসাইজ সেরে, ডিকির সঙ্গে এক দফা বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে দেখলে তার বাবার খাটে এক অতিকায় কুম্ভীরের মত দিব্যি হাত পা মেলে শুয়ে আরাম করছে মিঃ গোমেজ। দেখে তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল ক্রোধ তীব্র যন্ত্রণার আকারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে লাগল।

সে আরক্ত দৃষ্টিতে, অগ্নিগর্ভ অন্তরে তাকাল মিঃ গোমেজের দিকে। তারপরই নজর পড়ল মেঝের পুরানো গালিচার উপর প্রকাণ্ড তোবড়ানো পুরানো বিটকেল ট্রাঙ্কের উপর। তারপরই গর্জন করে উঠল—এই পুরানো ভাঙা ট্রাঙ্ক দুটো এখানে কেন?

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে গোমেজ সাহেব বললে—যেহেতু ট্রাঙ্ক দুটো আমার! পুরানো ভাঙা বটে ট্রাঙ্ক দুটো কিন্তু খুব শক্ত, আমার মত।

—আপনিই বা এখানে আবার বাবার বিছানায় শুয়ে কেন? আর আপনার ট্রাঙ্ক দুটোই বা এখানে কেন?

—কারণ, আমি তোমার বাবার জুতোয় পা গলিয়েছি। তেমনি শান্ত কণ্ঠের উত্তর।

—মানে? চাপা গলায় নিদারুণ রাগে চীৎকার করে উঠল ডেভিড।

মানে বলার জন্তেই বোধ হয় গোমেজ সাহেব এবার খাটের উপর ধীরে সুস্থে উঠে বসল। যেন অতিকায় কুম্ভীর এইবার লেজের একটা ঝাপটা মারবে।

এই অর্থবোধ নিয়েই হয়তো একটা গোলযোগ বেঁধে উঠত কিন্তু তার মা এসে পড়ায় আর সেটা হতে পারল না। তার মা এই সময় বোধ হয় নীচে রাস্তায় গিয়েছিলেন কিছু খুচরো জিনিস কিনতে। মা তাদের দুজনকে প্রায় যুদ্ধোদ্যত লক্ষ্য করে ছুটে এসে পড়ল তাদের মাঝখানে। হাঁ হাঁ করে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি, হয়েছে কি?

ডেভিড উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—মিঃ গোমেজ এখানে কেন?

গোমেজ তার মায়ের উপস্থিতিতেই শান্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বললে—অ্যানি, সব চেয়ে ভাল হয় তুমি যদি এর জবাবটা দাও। কারণ আমি জবাব দিলে শুধু মুখের কথা দিয়েই দেব না, আমার প্রকাণ্ড হাতখানাও ব্যবহার করতে হতে পারে। আমার মনে হয় সেটা আমাদের কারও পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ হবে না।

তার মা একেবারে বিপর্যস্ত ও অসহায় হয়ে পড়ল যেন। তার মুখখানা সাদা হয়ে গেল। সেই বিবর্ণ মুখে সে একবার ডেভিড একবার গোমেজের দিকে চাইলে।

মায়ের ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখখানা দেখে তার বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিতে লাগল। আর তারই জন্তে মা একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে দেখে সে নিজেকেই ধিক্কার দিলে মনে মনে।

তার মা কোথাও যেন আশ্রয় খুঁজে পেলে না। না পেয়ে বললে—ডেভিড, বাবা, তুমি মিঃ গোমেজের সঙ্গে ঝগড়া করো না। কারণ আমি এখন অ্যান রোজারিওর বদলে অ্যান গোমেজ। হি হ্যাজ্ বিকাম ইওর স্টেপ-ফাদার। তোমার সৎ-বাবা উনি।

ডেভিডের বুকের ভিতরটায় মা যেন একটা গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে দিলে। শূয়ার মারবার জন্তে তার বুকের ভিতর গরম শিক ঢুকিয়ে দেবার সময় সে যেমন আর্ত চীৎকার করে তেমনি বুক-ফাটা চীৎকার করতে ইচ্ছা হতে লাগল তার। কিন্তু সে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে—আমি তো তা জানতাম না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

লজ্জার সঙ্গে সে লক্ষ্য করলে মিঃ গোমেজ আবার বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার গোঁফের নীচে ঠোঁটের উপর এবং দুই কপিশ চোখে একটা দুষ্ট হাসি ঝিলিক দিয়ে বেড়াতে লাগল।

সেটা দেখে সে মাথা হেঁট করে পরাজিত সর্বস্বান্তের মত শ্লথ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গোমেজ বাধা দিলে পিছন থেকে। তাকে ডেকে বললে—আরে, তুমি চললে কোথায়? আমার ঐ তোবড়ানো, ভাঙা, পুরানো ট্রাঙ্ক দুটো সরিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে যাও।

অ্যান এইবার বাধা দিয়ে উঠল—তুমি যাও ডেভিড! ও ট্রাঙ্ক আমি যা করবার করব।

ঘর থেকে চলে যেতে যেতে ডেভিড শুনতে পেলে, মিঃ গোমেজ বলছে—তুমি করবে? আচ্ছা, তাই বেশ! তবে ও তো একজন ছোকরা, গায়ে বেশ জোর আছে, ও করলেই ভাল হত।

কতক্ষণ নিজের পড়ার টেবিলে সে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে ছিল তা খেয়াল নেই, তবে মা একবার রাত্রিতে খাবার জন্যে ডেকেছিলেন এই মনে আছে। কিন্তু টেবিলে মুখ গুঁজে সে অপমান ও আত্মগ্লানি আস্বাদ করছিল; সেখান থেকে ওঠেনি। অনেক রাত্রিতে মা এসে তার মাথায় হাত রাখতে সে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। আর তারপরই মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল—তুমি আর আমার মা থাকলে না মা?

তার এই কথায় অ্যানাও অস্থির হয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—এ কথা কে বলেছে? আজকে আমি রোজারিও থেকে গোমেজ হয়েছি। কখনও হয়তো আরও অন্য কিছু হতে পারি। কিন্তু আমি চিরদিন তোমার মা থাকব।

অনেক কান্নার শেষে সেদিন মা বলেছিল—যাও শোও গিয়ে। মন খারাপ ক'রো না। মনে রেখো তোমার জীবন তোমারই। মনে রেখো তোমার বাবার কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে তুমি আর্টিস্ট হবে। সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখো। আর মিঃ গোমেজের সঙ্গে তুমি বেশী মিশো না!

কান্নায় কান্নায় মা তার সমস্ত যন্ত্রণা আর অভিযোগ ভাসিয়ে দিয়ে,

নিজের স্নেহের শঙ্ক দিয়ে ঢেকে আর বিচিত্র আশ্বাসবোধ দিয়ে শুইয়ে চলে গেল!

তারপর থেকে আরম্ভ হল প্রতিদিন অপমানের কলঙ্ক-লেপন আর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ-স্নান।

নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়েই বাস করতে লাগল সে।

মিঃ এণ্ড্রু গোমেজ রেলের গার্ড। সপ্তাহে চারদিন বাইরে থাকেন ডিউটিতে, তিনদিন বাড়িতে অহোরাত্র অধিষ্ঠান। যে তিন দিন তিনি বাড়িতে থাকেন সে তিন দিন চোরের মত থাকে ডেভিড। সে সময় সে যথাসম্ভব বাইরে বাইরে কাটায়।

এরই মধ্যে একটা জিনিস সে বুঝে নিয়েছে। তাকে এই মানসিক ক্লেশের মধ্যেই লেখাপড়া করে যেতে হবে। ভোরবেলা উঠে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে সে লেখাপড়া করতে বসে। পড়াশুনো শেষ করে, বাজার করে দিয়ে ইস্কুলে যায়। আগে মা-ই বাজার করত। গোমেজ সায়েব সংসারের কর্তা হয়ে সেটা তার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। মা আপত্তি করেছিল। কিন্তু তিনি শোনেন নি। বলেছিলেন—আমি উপার্জন করি, তুমি উপার্জন কর, কিন্তু ডেভিড কি করে?

মা বলতে গিয়েছিল—ওর তো এখন উপার্জনের সময় নয়। ওর এখন—

ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল মিঃ গোমেজ, বলেছিল—তর্ক করো না। থাম তুমি। যে নিজের রুটি বিনা পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে খায় সে পাপী। সে পাপ যেন তোমার ছেলে না করে! আমি তা কিছুতে ঘটতে দেবো না। আমি অন্তত তাকে কিছু কাজ করাবই।

কিছুদিন যেতে না যেতেই গোমেজ সায়েবের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য তার নজরে পড়েছিল। মিঃ গোমেজ যে নিজে একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এইটি তিনি কথায় কথায় বুঝিয়ে দিতেন। নিজের প্রয়োজনমত ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে যখন তখন তিনি কোটেশন দিতেন, এবং সেই কোটেশনের নিজের সুবিধামত অর্থ করতেন। কাজেই বাইবেলের উদ্ধৃতির সাহায্যে বাজার করাটা তিনি একরকম জোর করেই ডেভিডের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

ডেভিড তাতেও কিছু মনে করেনি। সেও মনে মনে অনুভব করেছিল

সংসারের একজন মানুষ হিসেবে তারও কিছু কিছু করা উচিত। তাই সে প্রসন্ন মনেই বাজার করত।

কিন্তু বাজার করেও ছুটি কোথায়? গোমেজ সায়েবের হাতে ছুটির দিনে অনন্ত অবসর। ডেভিড বাজারের থলির ভারে ঝুঁকে পড়ে ঘেমে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরলেও তার নিস্তার ছিল না। সেই অবস্থায় তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গোমেজ সায়েব বেশ ধীরে সুস্থে তার কাছ থেকে বাজারের হিসেব নিতে বসতেন।

কিন্তু সে চঞ্চল হয়ে উঠত। তার যে ইস্কুলের সময় আসন্ন।

কিন্তু সেই সময়েই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব নেবার সময় হত গোমেজ সায়েবের। তার বিপন্ন অস্থিরতা সে যেন অন্তরে অন্তরে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করত এবং তার স্থির ধীরতার প্যাঁচানো স্ক্রু দিয়ে তার অন্তরকে শীতলভাবে বিদ্ধ করে চলত।

আলুর সের বলছ সাড়ে ছ আনা, তা হলে দেড় পোয়া আলুর দাম কত হল?

নিজের মনে মনে হিসাব করতে আরম্ভ করত গোমেজ—সাড়ে ছ পয়সা আর সোয়া তিন পয়সা, মানে হল পৌনে দশ পয়সা, মানে ন পয়সা!

প্রতিবাদ করতে হত ডেভিডকে—না, দশ পয়সা! আলু ওজনে একটু বেশী আছে!

—না কি? না, ঐখান থেকে এক পয়সা সরিয়েছ?

—কি বলছেন আপনি?

গোমেজ সায়েব অতঃপর তার এক পয়সা চুরি যেন মেনে নিত নির্বিরোধ মানুষের মত। বলত—বেশ, বেশ, তাই হল। একটা পয়সা না হয় গেল। তারপর?

অধৈর্য হয়ে ডেভিড বলত—তারপর কি?

—তারপর টমাটো! টমাটোর সের কত বললে যেন? দশ আনা? আশ্চর্য! আমি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে সেদিন দেখলাম সাত আনা সের! আজ দশ আনা হয়ে গেল?

আবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত ডেভিডের। বলত—তা হলে আপনি কাল থেকে বাজার যাবেন। আমি পারব না!

এইবার গোমেজ সায়েবের শান্ত সহনশীল ধীরতার অন্তরাল থেকে অতি হিংস্র, বিদ্বিষ্ট মানুষটি তার দুই চোখের কপিশ তারার নিষ্ঠুর উজ্জ্বল দীপ্তির

মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করত। মুখের রেখার এতটুকু বদল না করে আস্তে আস্তে অতি শীতল কণ্ঠে বলত—পারবো না মানে? তোমাকে পারতে হবে। আমরা দুজনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে আনব, আর তুমি আরাম করে রোস্টের হাড় চিবোবে, তা হবে না!

গোমেজের এই রূপের সামনে তার অন্তঃকরণটা কুঁচকে যেত, সে ভয়ও পেত। আর কোন কথা না বলে বলত—নিন, বাকী হিসেবটা নিয়ে নিন।

গম্ভীরভাবে গোমেজ তারপর বলত—বল। মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ।

ডেভিডের মনে একটা আশ্চর্য সহনশীলতা এবং শক্তি ধীরে ধীরে ফুটে উঠত যার ফলে সে আর চঞ্চল হত না। এই হিসেবের জন্যে সময় খরচাটাকে অনিবার্য হিসেবেই ধরে নিত।

গোমেজ সায়েবকে সব হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে সে স্নান করতে যেত। তখন সমস্ত মনটায় আর কোন চাঞ্চল্য থাকত না, কিন্তু মনটা যেন মেঘে-ছাওয়া আকাশের মত অন্ধকার থমথমে হয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থাতেই ইস্কুল ছুটত সে। তবু মাঝে মাঝে সান্ত্বনার মত মনে হত যে তার ধীরতা ও স্থৈর্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বুড়ো শয়তান কুমীরটাকে সে জব্দ করে এসেছে।

কিন্তু মনের মেঘলা ভাবটা সহজে কাটতে চাইত না। ইস্কুলে কত হাসি হাসি মুখ, কত কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাস, গত গল্প! তবু এই আনন্দের আসরেও মনটা কিছুতেই নির্মেঘ হত না। তবে কোন এক সময় মনের মেঘ-ছাওয়া আকাশও একটা নিশ্চিন্ত ঝড়ের হাওয়ায় আবার মেঘমুক্ত হয়ে আনন্দ ও প্রসন্নতার সূর্যালোকে ঝলমল করে উঠত।

সেটা ঘটত ফাদার নর্টনের ঘণ্টায়।

সপ্তাহে পাঁচদিন পর দুটো ঘণ্টা পড়াতেন ফাদার নর্টন। ইংরেজী পাঠ্য আর তারপর ইতিহাস। কিন্তু ফাদারের পড়ানো ছিল অতি বিচিত্র। তিনি এক নাগাড়ে দু ঘণ্টা পড়াতেন এবং একই সঙ্গে দুটো জিনিস পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি আইনকানুন ছিল না। সে তো পড়ানো নয়, সে একটি অতি অপরূপ আশ্চর্য অনুভব!

পড়ানো আরম্ভ হত হয়তো একটি তুচ্ছ শিশুপাঠ্য কাহিনীতে। কিন্তু সেই সামান্য কাহিনী যে কোন্ অসামান্যের উপকূলে তাদের নিয়ে যাবে তা তারাও জানত না, ফাদার নিজেও জানতেন না। ইংলণ্ডের কৃষক

পরিবারের একটি গাথা কবিতা পড়াতে পড়াতে কাদার তাঁর দলবলকে নিয়ে চলে যেতেন প্রথমে ইংলণ্ডের সমুদ্র-উপকূলের এক কাউন্টির একটি গ্রামে। সেখানকার সেই সমুদ্রপথের অপরিচিত, স্বপ্নমণ্ডিত একটি শান্ত জনপদের অতি-সত্যের মধ্যে নিজের শ্রোতাদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে তাদের নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করতেন। এবার যাত্রা ইতিহাসের পথ ধরে। হেস্টিংস যুদ্ধের অনেক আগে, যখন অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ইংলণ্ডে রাজত্ব করত তারও আগে তাঁর শ্রোতাদের নিয়ে চলে যেতেন—যেখানে ইতিহাসের দিন আর কাহিনী, কল্পনা আর পুরাণের রাজত্বে পৌঁছে এক আশ্চর্য গোধূলিলগ্নের সৃষ্টি করেছে। সেখানে মানুষের জীবনের সঙ্গে দৈবী ক্ষমতা এসে মিশেছে; যুক্তিগ্রাহ্য লৌকিক কাজের সঙ্গে অলৌকিক অতি-প্রাকৃত ঘটনা এসে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

সেই পটভূমিকায় আরম্ভ হত রাজা আর্থারের গল্প। রাজা আর্থার অলৌকিক দৈবী শক্তিতে বলীয়ান। তাঁর রাউণ্ড টেবল্-এর মানুষরা আজকের মানুষের মাপের থেকে অনেক বড়, অনেক অনেক প্রাচীন সেই বীর নাইটকুলের শিরোভূষণ স্যার ল্যানস্‌লট। ইংলণ্ডের অতি স্বল্প জনপদে অতি সামান্য কিছু মানুষের বসতি সেদিন। ভূমিখণ্ড অরণ্যে ভরা। অরণ্যে ভয় আর মৃত্যু, লক্ষ লক্ষ বিচিত্র সরীসৃপ আর চতুষ্পদের আকার নিয়ে বাঁকে বাঁকে ওৎ পেতে বসে আছে। এই বীরদের যুদ্ধ ভয় আর মৃত্যুর সঙ্গে। সেই ভয় আর মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতি পদক্ষেপে সেই বীরদের জয়। বুকে তাঁদের দুর্জয় সাহস, চোখে শিশুর সরলতা। তাঁরা নির্ভীক।

কিন্তু তাঁরা মাথা নামান তিনটি স্থানে। ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সে শ্রদ্ধার প্রথম স্থান ঈশ্বর, দ্বিতীয় রাজা, আর তৃতীয়—

তৃতীয় হল নীল-নয়না কোন আশ্চর্য সুন্দরী তরুণী। ফুলের মত নারী। ফুলের মত সুন্দর, ফুলের মত পবিত্র, ফুলের মত অপাপবিদ্ধ।

তাঁদের সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত জয়, সমস্ত খ্যাতির উৎসমূলে এই নারী! সমস্ত জয় অর্জন করে সেই জয়ের পাত্রটি পরম শ্রদ্ধা ও গভীর প্রেমের সঙ্গে সেই নারীর পদপ্রান্তে উৎসর্গ করেছেন তাঁরা। প্রতিদানে অতি প্রগাঢ় প্রেমের সঙ্গে একবার সেই শ্বেতবসনা লাজনম্রা সুন্দরীর ডান হাতখানি নিজের তৃষ্ণা-কাতর, উত্তপ্ত ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করেন। সেই তাঁদের জীবনের চরম পুরস্কার।

এই রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা রানী গুইনিভা, রাজা আর্থারের স্ত্রী।

শুনতে শুনতে ডেভিডের বুক দুর দুর করতে আরম্ভ করত। তিনি যেন কোন্ এক ভিন্ন জগৎ থেকে সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য এক অঙ্গে ধারণ করে এই কলকাতা শহরের ট্রাম-বাসের শব্দে মুখরিত একটি বাড়িতে একখানা ঘরের গাঢ় নৈঃশব্দ্যের সুযোগ নিয়ে চুপি চুপি নাটকের নায়িকার মত এখানে পদপাত করতে উদ্যত হয়েছেন। ডেভিড যেন তাঁকে চোখের উপর দেখতে পেত।

ডেভিড যে আগে থেকেই তাঁকে চেনে।

ডি. জি. রসেটি বলে একজন শিল্পীর আঁকা গুইনিভার একটি বিষণ্ণ মূর্তির স্কেচ সে দেখেছে। বার বার দেখেছে। সেই গুইনিভাই এই মুহূর্তে হাসি হাসি মুখে, নায়িকার সকৌতুক হাসি মুখে নিয়ে নেমে আসছেন।

ফাদার নর্টন বলে চলেছেন—কিন্তু এই গুইনিভার অন্তরে বিষ ছিল। যে পবিত্রতা, প্রেমের ক্ষেত্রে যে অনন্যমনস্কতা স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য, তারই অভাব ছিল এই অপরূপা সুন্দরী নারীর মধ্যে।

ডেভিডের চোখের দৃষ্টি ততক্ষণে স্বপ্নালু হয়ে উঠেছে। মনে একটি গাঢ় আবেগের যেন পরিপাক চলেছে। জীবনের অমৃতপাত্রে মৃত্যুর একটি আধটি বিন্দু মিশিয়ে যে বিচিত্র রসায়ন তৈরী হয়—যার আস্বাদ মনুষ্যকুলের কাছে প্রিয় তাই উপস্থিত তার সম্মুখে। তার বিচিত্র তীব্র আস্বাদে বিভ্রান্ত না হয়ে উপায় কি?

সেই বিষকে কেন্দ্র করেই তার পরিণাম অনিবার্য হয়ে উঠল। যুদ্ধ। একদিকে রাজা আর্থার, অন্যদিকে স্যার ল্যান্সলট।

কিন্তু স্বপ্নজাল ভেঙে গেল কেন? ফাদার নর্টন বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন? তাহলে কি যুদ্ধ হয় নি?

কে জানে!

কিন্তু ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। তিনটে বাজল।

ফাদার নর্টন বেরিয়ে গেলেন ক্লাস থেকে। প্রতিদিনের মত বলে গেলেন—কালকের জন্য!

ফাদার নর্টন চলে গেলেন ক্লাস থেকে। কিন্তু দিয়ে গেলেন অনেক। তার মনের দিক-দিগন্ত এক আশ্চর্য স্বপ্নাবেশের সোনার মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। সেই স্বপ্নালোকের ছায়ায় কথা স্তব্ধ, চোখ স্বপ্ন-মেদুর, পৃথিবীর

উপরেই আশ্চর্যের সোনার ছায়া এক মায়া-উত্তরীয়ের মত বিছিয়ে গিয়েছে।

আর পাশে স্থূল লৌকিক পৃথিবীর কত কোলাহল! সে কোলাহলের মধ্যেও তার মন তখনও স্বপ্নাচ্ছন্ন। কে একজন ডাকলে তাকে। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অর্ধ-সচেতন হয়ে সে ছোট্ট জবাব দিলে—উঁ?

—ছুটি হয়ে গেল! চল্। জিমনাসিয়ামে যাবি না?

—চল্। অন্যমনস্ক হয়েই যন্ত্রের মত বইগুলি তুলে নিয়ে সে সঙ্গীর সহযাত্রী হল।

বন্ধু ভিক্টর জানে ডেভিড এমনিই! ফাদার নর্টনের গল্প তারও ভাল লাগে। কিন্তু সে এমন হয়ে যায় না। ভিক্টর জানে ডেভিড আর্টিস্ট, আর আর্টিস্টরা একটু সেন্টিমেণ্টাল হয়।

পথে ডেভিড নির্বাক। ভিক্টর বলে—ডেভিড, তুই ওসব একসারসাইজ ছেড়ে দে। ছেড়ে দিয়ে বক্সিং শেখ। তোকে কত দিন থেকে বলছি।

ডেভিড আস্তে আস্তে বলে—না, বক্সিং শিখে আমার কি হবে? আমি তো মারামারি করতে যাচ্ছি না।

—আজ করতে হয়নি বলে কোন দিন করতে হবে না এমন তো কোন কথা নেই! কবে কে শত্রু হয়ে যায় তার ঠিক কিছু আছে? এই আমিই হয়তো তোর কবে কোন্ মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করে বসব। আর তার পরই তোর মুখে একটা ঘুঁসি মেরে দোব। তখন তুই আটকাবি কি করে?

ডেভিড হেসে বললে—মোটেই না! তবে একসারসাইজ করে গায়ে জোর বাড়াচ্ছি কেন?

—কি করবি জোর নিয়ে?

—দেখবি? বলে ফুটপাতের উপর বইখাতাগুলো নামিয়ে রেখে অকস্মাৎ ভিক্টরকে দুই হাতে চেপে ধরল। তারপর বললে—ছাড়িয়ে চলে যা।

ভিক্টর খানিকটা চেষ্টা করে বললে—নাঃ, শক্ত আছে। কিন্তু ঘুঁসি মারলে তো তুই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবি।

ডেভিডের মুখে তখনও হাসি খেলা করছে। সে আস্তে আস্তে

ভিক্টরকে ছেড়ে দিয়ে বললে—তুই আমাকে ঘুঁসি মারবি, আর আমি চুপ করে থাকব না কি ?

—তবে কি করবি ?

তোকে চেপে ধরে হেসে বলব—মারিস না রে, আমার লাগছে ! কেন রাগ করছিস, রাগটা থামা, আমার মুখের দিকে তাকা, দেখ তো, আমি কি রেগে গেছি ?

ভিক্টর তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বললে—বুঝলাম, you want to fight in the Christian way, তুই খ্রীষ্টানের মত লড়বি ! বলে ভিক্টর হাসতে লাগল।

অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে বললে—তা তোর অতিকায় কুমীরের খবর কি ? তোর সেই স্টেপ-ফাদার, মিঃ গোমেজ ? সে তোকে কামড় মারছে, আর তুই খাঁটি খ্রীষ্টানের মত কেঁদে কেঁদে বলছিস তো—লর্ড, ওকে ক্ষমা কর !

ডেভিড হাসছিল বটে, কিন্তু তার মুখখানা ম্লান হয়ে এল।

ভিক্টর বললে—সেই জন্যে তো বলেছিলাম বক্সিং শেখ।

ডেভিড গম্ভীর হয়ে বললে—নাঃ। আমাকে খানিকটা কষ্ট দেয় এ কথা ঠিক। হি ইজ্ এ বুলি অ্যাণ্ড হিপোক্রিট। কিন্তু সেও তো মানুষ ! এক সঙ্গে থাকতে হয়, না সহ্য করে উপায় কি ? আর তা ছাড়া—

ভিকটর বললে—What else ? তা ছাড়া আবার কি ?

—ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে মা মনে মনে দুঃখ পাবে।

ভিক্টর চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ পর চলতে চলতে বললে—You are very good David. You are not like others. তুমি অন্য সকলের মত নও !

ডেভিড বললে—চল, চল, তাড়াতাড়ি চল। দেরি হয়ে গেল।

জিমনাসিয়ামে একমনে ব্যায়াম করে ডেভিড। পেশীর সঞ্চালনে, বুকের দ্রুততর গতিতে, ঘর্মসিক্ত হয়ে একটা তীব্রতর, গম্ভীরতর, সুস্থতর, জীবনের আস্বাদ অনুভব করতে লাগল সে। ব্যায়ামের পর্যায়ের মাঝে মাঝে দীর্ঘ লম্বিত নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে জীবনের মধ্যেই একটা গভীরতর ভেদকে অনুভব করতে লাগল সে। সে সুস্থ সুন্দর জীবন রচনা করবে ! তার মধ্যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না, অকারণ উত্তেজনা থাকবে না। সুস্থ, সহজ, সরল জীবন !

ব্যায়াম শেষ করে অনেকক্ষণ সেইখানেই বসে শান্ত সহজ হল। তারপর সেইখানেই স্নান সেরে আবার জামাকাপড় বদল করে বেরিয়ে যাবার জন্ত তৈরী হয়েছে এমন সময় ডিকি এসে হাজির!

জিমনাসিয়ামের বাইরে বিরাট বিচিত্র ধরনে সাইকেলের ঘণ্টা বাজছে। ডিকি অপেক্ষা করছে বাইরে।

ডিকি আগে এখানেই একসারসাইজ করত। ঝগড়া করে এখন অন্ত আখড়ায় চলে গিয়েছে। তাই সে এখানে ভিতরে আসে না। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে একটা বিশেষ ধরনে ঘণ্টা বাজায় যাতে করে ডেভিড ঠিক বুঝতে পারে ডিকি এসেছে।

সে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ডিকির সাইকেলের পিছনে উঠে তাদের যাত্রা আরম্ভ হল।

সে ঘোরার কি কোন বিধিবদ্ধ কায়দা আছে?

প্রথমেই ডিকির সঙ্গে সে গিয়ে উপস্থিত হল ইলিয়ট রোডে এক দোকানে। ডিকির চেনা দোকান। সেখানে বইগুলো রেখে দোকানের সাইকেলখানা বের করে বিনা বাক্যে রাস্তায় নামিয়ে ডেভিডের হাতে ধরিয়ে দেয় ডিকি। দোকানদার ডিকির পরিচিত, দেখেও সে দেখে না। কোন কোন দিন তার কাজের অবসরে হাতে সময় থাকলে, কিংবা মেজাজ হলে সে ডেকে বলে—হে ডিকি, তুমি আমার সাইকেল নিতে পাবে না!

—কেন? তুমি বলবে তবে তোমার সাইকেল নেব?

—বাঃ, আমার জিনিস, তুমি আমাকে না বলে নেবে কি রকম? সাইকেল আর দেব না তোমাকে। তুমি আমাকে ভাড়া দিচ্ছ না।

ডিকি হাসে রহস্ত বুঝে। বলে—আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেব কেন? আর দিয়েই বা কি হবে? তুমি বসে বসে টাকা গোন। তাতেই তোমার সব হবে!

ডেভিড এ কথার আপাত অর্থের পিছনের অর্থও বুঝতে পারে। তার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। এ ধরনের রসিকতা তার ভাল লাগে না। তবে এ ভাল-না-লাগাটা তার একান্ত নিজস্ব। এ মনোভাব প্রকাশ করে কোন লাভ নেই; আর প্রকাশ করারও বিপদ আছে। এখনি হয়তো ডিকির সঙ্গে কথা-কাটাকাটি থেকে ঝগড়া, শেষে মারামারি হয়ে যাবে।

ডিকি আর ধৈর্য ধরতে পারে না। সে তাড়া দিয়ে বলে—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? চল, সাইকেলে ওঠ।

দুই সাইকেলে চেপে দু'জনে পাশাপাশি চলতে থাকে। ইলিয়ট রোড, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, রিপন স্ট্রীট, পার্ক লেন চষে ফেরে দুজনে। দুজনে যেতে যেতে এক জায়গায় রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টা বাজায়, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সাইকেল-আরোহী বেরিয়ে আসে। ক্রমে তিনজন চারজন হয়, চার পাঁচে পড়ে, পাঁচ গিয়ে ছয়ে দাঁড়ায়।

শুধু তরুণ নয়, তরুণীরাও আসে একে একে।

ছেলেদের পরনে প্যাণ্ট কিম্বা হাফ প্যাণ্ট, গায়ে হাফসার্ট কিম্বা নানান বিচিত্র ছাপ-ছাপ লাগানো কাউবয় শার্ট, গলায় রুমাল বাঁধা, মাথার সামনের চুল একটু উঁচু করে তোলা। কারও কারও মুখে মাউথ অর্গ্যান, কারো মুখে সিগারেট বেশ কায়দা-মাফিক মুখের কোণে ধরা। ওরই মধ্যে কেউ কেউ এক হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে অন্য হাতে মাউথ অর্গ্যান বাজাতে বাজাতে চলেছে। কারও উল্লাস হয়তো অকস্মাৎ অতি প্রবল হয়ে উঠল, সে মাউথ-অর্গ্যানওয়ালাকে টেক্কা দিয়ে, সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে হাত তুলে নিয়ে, মুখের মধ্যে হাত দুটো পুরে সজোরে সিটি মেরে উঠল। তার কোলের কাছে সামনে-বসা মেয়েটি কপট ভয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অতীব তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বান্ধবীদের খিলখিল হাসি। সে হাসি বেহিসাবী যৌবনের প্রবল সর্বগ্রাসী উল্লাসধ্বনি, যা শুনলে পথচারীর হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগে, রক্ত উল্লাসে উতরোল হয়ে ওঠে; যা কানে এলে স্থবিরতা ভয়ে কেঁপে ওঠে; যা শুনলে সকলের মনে একবার আকস্মিক ইচ্ছা হয় যৌবনের ঐ প্রবল, পরিণামহীন জোয়ারে বিবেচনাহীন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

দল বেঁধে সাইকেলে চলেছে তারা। সাইকেল চালাচ্ছে ডিকি, টম, হ্যারি, ডেভিড, স্যামের দল। তাদের কোলে কোলে সাইকেল আলো করে সামনে বসে আছে ডরোথি, লুসি, কিটি, জুলিয়া আর মার্গোরা। সাইকেল-আরোহীদের ভ্রুক্ষেপ নেই কোনো দিকে। পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে, গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাবে তাদের। প্রয়োজন হলে সাইকেল-আরোহী পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটন্ত গাড়িখানার পাশ দিয়ে সর্পিল তীক্ষ্ণতায় সরে যাবে যাতে সহগামিনী বান্ধবী আবার চীৎকার করে উঠবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সিটি, মাউথ-অর্গ্যান আর তীক্ষ্ণ হাসি!

সাইকেল-যাত্রীর দল একটা পার্কে থামল।

এখানে পথ জনহীন; গ্যাসের আলোর যৎসামান্য আলো বৃত্তের চারিপাশে অন্ধকার নরম কালো ভেলভেটের মত জমে আছে। মাথার উপরে পত্রভারসমৃদ্ধ গাছ দু পাশ থেকে যেন মাথায় অন্ধকারের ছাতা ধরে আছে। নীচে পীচ-ঢালা, চকচকে, মসৃণ, পরিচ্ছন্ন পথ। দু পাশে বড় বড়, নিঃঝুম, প্রাসাদ-তুল্য বাড়ি। তারা যেন এই নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের বালিশে ঠেস দিয়ে এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে।

গায়েই পার্ক। পার্কও জনহীন হয়ে এসেছে।

—এবার কোথায় যাবে? সকলেরই প্রশ্ন একজনের কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠল।

প্রশ্ন এক, কিন্তু তার সমাধান অজস্র।

—ময়দানে চল। মেমোরিয়ালের ধার দিয়ে।

—না, ময়দানে গিয়ে কি হবে? তার চেয়ে হোটেলে চল!

—হোটেলে? ভারী বাহাদুর! রেস্ত কোথায় যে হোটেলে ঢুকবে?

—হোটেলেই যাব। কার কাছে কি আছে দাও। সব একসঙ্গে করে দেখি কত হয়।

পয়সা, আনি, দুয়ানি থেকে সিকি পর্যন্ত সংগ্রাহকের হাতে এসে জমা হতে লাগল।

—আমরা কত জন আছি?

গোনাও আরম্ভ হল সঙ্গে সঙ্গে। দেখা গেল, পনের জন।

—তা হলে এই সাড়ে চার টাকায় কি হবে এতজনের? তার চেয়ে পয়সা ফেরত দিয়ে দাও সকলকে। দিয়ে ময়দানে চল। কিছুক্ষণ গল্প করে আসি।

—আচ্ছা, তার আগে বল কি খাবে তোমরা?

—কেন, তুমি খাওয়াবে নাকি?

—ধর তাই। এই নাও। বলতে বলতে ডোরা টাকা বের করে দিলে।

—কত টাকা?

—ধর, হাতে নাও, নিয়ে দেখ! ডোরা হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

নোটখানা হাতে নিয়ে টম বললে—লর্ড, এ যে একেবারে 'টেনার'! দশ টাকার নোট! তুমি কি সবটাই দিয়ে দিচ্ছ ডোরা?

ডোরা উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, হাসবার সময় নিজের সুসজ্জিত, বড় বড়

দাঁতের সারি, রঞ্জিত রক্তিম ঠোঁটের অন্তরাল থেকে বিশেষ করনে প্রকাশ করে। সে জানে তার স্বাস্থ্যের সঙ্গে এই হাসি সে যখন হাসে তখন তাকে প্রায় প্রাণঘাতিনী মনে হয়। সেই হাসি হেসে সে বললে—সবটাই! তোমার কি আরও চাই?

ডোরার বাহক হ্যারি তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে তার শাণিত খড়্গের মত স্বল্প-প্রভাদীপ্ত দাঁতের দিকে দৃষ্টি রেখে বললে—থাক। আর দিতে হবে না।

ও দিক থেকে লুসি বলে একটি মেয়ে, প্রতিবাদ করে উঠল—কেন, আর দিতে হবে না কেন? সেদিন তো আমি পনের টাকা দিয়েছিলাম। ও-ই বা আজ দেবে না কেন?

হ্যারি গম্ভীরভাবে বললে—না, ও দেবে না! কারণ, ও তোমার মত পয়সাওয়ালা মানুষ নয়!

ও দিক থেকে লুসির বন্ধু টম চীৎকার করে উঠল—শাট আপ হ্যারি। আর একটি কথা বলেছ কি তোমাকে সোজা করে দেব।

—মানে? সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যারি।

এইবার মারামারি হবে। তার মধ্যে এসে পড়ল ডিকি। সে গম্ভীর-ভাবে বললে—প্লিজ, প্লিজ। আমার একটা কথা শোন।

দুজনের ঘুঁসি তখন পরস্পরের দিকে উদ্যত।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে ডিকি বললে—আমার মাত্র একটি অনুরোধ আছে। সামান্য অনুরোধ। টম আর হ্যারি পরস্পরকে ঘুঁসি মারবার জন্যে তৈরী হয়েছে। আমার অনুরোধ, তোমরা পরস্পরকে না মেরে তৃতীয় ব্যক্তিকে মার।

হ্যারির রাগ তখনও কমে নি। বরং ডিকির কথাগুলোকে খোঁচা হিসেবে ধরে উত্তেজনার খোরাক পেয়ে ছিল। সে রাগত ভাবে বললে—সে তৃতীয় ব্যক্তি কে? তুমি?

—না। আমি নই। হিয়ার ইজ্ এ ক্রিশ্চিয়ান জেণ্টল্‌ম্যান অ্যামাংস্ট আস্। ইউ ক্যান টেক হিম অ্যাজ দী থার্ড পার্সন। খ্রীস্টান ভদ্রলোককে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তোমরা ঘুঁসি মারতে পার।

বলে সে ডেভিডকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ক্রুদ্ধ উত্তেজনা পরম কৌতুকে বিগলিত হয়ে গিয়ে সকলে অট্টহাস্য করে উঠল।

ডিকি বললে—তোমরা হেস না। আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে আমি ঐ দশ টাকার উপর আরও পাঁচ টাকা দিতে পারি। তা হলেই সেদিনকার মত পনের টাকা হয়ে যাবে। রাজী?

সমস্বরে চীৎকার উঠল—রাজী!

—এখন কোথায় যাওয়া হবে?

—দেখ, এই নিয়ে আর ঝগড়া চলবে না। সে দিনের মত যখন পনের টাকা পাওয়া গেল তখন সেদিন যেখানে সকলে গিয়েছিলাম সেখানে চল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার উল্লসিত অট্টহাস্য, তীব্র চীৎকার, মাউথ-অর্গ্যানের বেসুর আওয়াজ, এবং সর্বোপরি তীব্র তীক্ষ্ণ সিটি। এই দলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডেভিড কিছুই করতে পারে না। আবছা অন্ধকারের মধ্যে সে শুধু বোকার মত হাসে যেন সেও খুব খুশি হয়েছে। সেই নিঃশব্দ হাসির মধ্যেই তার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের স্বরূপটি তার কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাছেই হোটেল।

অতঃপর সাইকেল হাতে নিয়ে, এ ওর গায়ে হেসে ঢলে ঢলে পড়তে পড়তে, হেলতে দুলতে যাত্রা। যেতে এ ওর গায়ে ধাক্কা দেয়; সে তার কানে ফিসফিস করে কি বলে! মেয়েটি হাসতে আরম্ভ করে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে। ষ্ট্যান্সি বলে একটি মেয়ে এসে ডেভিডের একখানা হাত উত্তাপের ও আবেগের সঙ্গে ধরে, গায়ে গায়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করে।

মেয়েটিই এক সময় ফিসফিস করে আরম্ভ করে—ওয়েল, ক্রিশ্চান জেণ্টল্‌ম্যান, তুমি এত চুপচাপ কেন?

—না তো! চুপচাপ কোথায়?

—যদি ভাল লাগে, তুমি এখানে না এসে চার্চে যাও না কেন?

ডেভিড হাসে। এই কিছুদিনের মধ্যেই সে অনেক বুঝতে শিখেছে। এই কথাগুলির মধ্যেই কোথায় একটি আহ্বানের অতি প্রচ্ছন্ন সুরকে শুনতে পেয়ে সে নিজের বাঁ হাতখানা ষ্ট্যান্সির কোমরের উপর অতি সন্তর্পণে ফুলের মালার মত প্রসারিত করে দিলে। ষ্ট্যান্সি কোন আপত্তি করলে না।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত! গভীর আবেগে সে তার কটিদেশ বেষ্টন করে ধরতে পারলে না। এই পরিবেশে জীবনের যে মৌল আবেগে অন্য সকলে আনন্দ-চঞ্চল হয়ে উল্লাসের সাগরে স্নান করে যৌবনের দ্বিধাহীন মত্ততার

মদিরার আস্বাদ গ্রহণ করছে তাও সে পারছে না পরিপূর্ণ ভাবে। অন্যদিকে এই মত্ত ফেনিল মদিরার আকর্ষণ তার পরিত্যাগ করে যাবারও শক্তি নেই।

কি করবে সে?

এই দ্বিধাই তাকে নীরব করে রেখেছে। এই দ্বিধাতেই হাতখানা পাশের যৌবনমদমত্তার কটিদেশে কঠিনভাবে লগ্ন হতে পারছে না, আবার এই দ্বিধাতেই হাতখানা সে সরিয়েও নিতে পারছে না!

খাওয়া, বাঁচা, হৈ-হৈ করা আনন্দ—সবই তার ভাল লাগছে, অথচ কোনটাই সে আকণ্ঠ পান করতে পারছে না।

সস্তা হোটেলে হৈ হুল্লোড় করে খাওয়া-দাওয়া হল। আবার হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে এল সকলে। রাত্রি খানিকটা গাঢ় হয়ে উঠেছে। গ্যাসের আলো সত্ত্বেও আকাশের দিকে চাইলে গাঢ় কালো কোমল ভেলভেটের উপর জরির ফুলের মত তারাগুলির উজ্জ্বলতা থেকে তা বোঝা যায়! কিন্তু কে তাকাবে আকাশের দিকে? পাশের একজন মানুষ অন্যজনের আকর্ষণের একতম বিন্দু হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে। সকলেরই প্রগলভতা কমে এসেছে, কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রাম থেকে নীচে নেমে এসেছে। তার বদলে নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন হয়ে, চোখের দৃষ্টিতে আবেশ ঘনিয়ে এসেছে, একে অন্যের হাত ধরেছে গভীরতর আবেগে, গাঢ়তর উত্তাপে।

সে দেখলে তার বাবার খাটে গোমেজ সায়েব শুয়ে আছে। আর পাশে চেয়ারে বসে মা পশমের কি বুনছে! মায়ের চোখে চোখ পড়তেই সে জিজ্ঞাসা করলে—কি বুনছ মা?

—পুলওভার!

বলে মা থেমে গেল। এই থেমে যাওয়া থেকেই সে বুঝতে পারল ওটা মা কার জন্যে বুনছে। তার জন্যে হলে মা সে কথাটাও বলত! সেইখানেই থেমে যেত না।

—আমার কথা শুনবে? অতিকায় কুম্ভীর তার আরামশয্যা থেকে গর্জন করে উঠল।

ডেভিড প্রায় চমকে উঠল। একবার মায়ের দিকে তাকালে। দেখলে, বুঝলে, পাছে তার মুখের দিকে তাকাতে হয় তাই মা পুলওভারের বুননের উপর বেশী করে ঝুঁকে পড়েছে। সে বুঝলে এই মুহূর্তে মা তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে তাকালে এণ্ড্রু সাহেবের দিকে।

এণ্ড্রু সাহেব বললেন—এস, এইখানে এস।

সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল।

হুকুম হল—খাটে এই আমার পাশে বস, বসে আমার পিঠটা আর পা'টা মাসাজ করে দাও।

সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি অপমান! তার বাবা তাকে কত আদরে মানুষ করেছেন। প্রতি মুহূর্তের সেই সমাদরে মা সানন্দে যোগ দিয়েছে। আজ সেই মায়ের সামনে তার এই অপমান মা সহ্য করছে মুখ বুঁজে।

সে একবার বললে—আমি মাসাজ করতে জানি না।

—জান না, আমি শিখিয়ে দোব! এস আমার কাছে। কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়!

শেষ পর্যন্ত সেই অপমান মাথায় নিয়ে বসতে হল নিজের বাবার খাটে অন্য একজনকে চাকরের মত সেবা করবার জন্য। তার হাত চলতে লাগল এণ্ড্রু সায়েবের পায়ের উপর আর এণ্ড্রু সায়েব সানন্দে 'হুঁ' 'হুঁ' করে তাল দিয়ে সমর্থন ও অনুমোদন করে যেতে লাগল।

এই সময় মা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

তার মনে হল তার কেউ নেই এ সংসারে। চরম অপমানের পরিমাপহীন পিচ্ছিল গহ্বরে তার এই পতনে সাহায্য করবার জন্যেই মা উঠে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, নিজেকে সে নিজে রক্ষা করবে। মনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল। হাতের সঞ্চরমান আঙুলের মাথায় যেন অস্বাভাবিক শক্তি ও নিষ্ঠুরতা এসে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে গোমেজ সাহেব সাপের মত ক্ষিপ্রতা নিয়ে লাফিয়ে উঠল খাট থেকে। এক মুহূর্ত স্থির, ক্রুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত টিপে সে বলল—শয়তানের বাচ্চা, তোমার মাথায় খুব বুদ্ধি আছে ভেবেছ?

পর মুহূর্তেই সেই অতিকায় স্থূল মানুষটির একটা নিষ্ঠুর ঘুঁসি এসে পড়ল তার মুখের উপর।

তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা। মানসিক অপমান তার চেয়েও তীব্র। সঙ্গে সঙ্গে সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকলে। জীবনে কেউ কখনো এর আগে তার গায়ে হাত দেয়নি।

আবার বোধহয় এণ্ড্রু সায়েবের হাত উঠছিল তাকে মারবার জন্যে।

কিন্তু ততক্ষণে মা ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরেছে। তীব্র ক্রোধে ও নিরুদ্ধ রোদনের সুরে মা বললে—করছ কি তুমি? থাম!

—কি করছি? শয়তানের বাচ্চাকে আজ আমি শিখিয়ে দেব।

ডেভিড তখন দুই হাতে মুখ ঢেকে থর থর করে কাঁপছে। তার ঠোঁট কেটে গিয়েছে, নাকেও লেগেছে। রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। মা তাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল। তারপর রক্ত ধুইয়ে দিয়ে আইডিন লাগিয়ে দিলে। এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে কিন্তু কাঁদেনি। শুধু মায়ের চোখের জল দেখে তার চোখ একবার জলে ভর্তি হয়ে উঠেছিল।

অনেক রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে, যন্ত্রণার মধ্যে কার স্পর্শে চোখ মেলে সে দেখেছিল মা তার কপালে হাত দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

কিন্তু মায়ের ঐ সামান্য চোখের জল তাকে কতটুকু আশ্রয় দেবে? চোখের জল, বুকের মমতা দিয়ে মা যতটুকু আশ্রয় দিয়েছিল তার চেয়েও বেশী কেড়ে নিয়েছিল ঐ স্থূল, ক্রোধী, ক্রুর মানুষটির কাজে প্রতিবাদ না করে।

সে কি অসহ্য যন্ত্রণা সে বোধ হয় জানেন তার ভগবান।

এরই ফলে সে কক্ষচ্যুত আলোকপিণ্ডের মত আপন আশ্রয়ের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে নিজের জীবনের সকল সুষমার উত্তাপ ও আলোক বিকিরণ করতে করতে ছুটে চলল ভস্মশেষ হবার পরিণামে। সে যাত্রার লৌকিক ইতিহাস হয়তো আর পাঁচটা সাধারণ কথার মত খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু মনোলোকের কোন ইতিহাস আর হদিস করা যাবে না।

পরদিন যখন ফোলা কাটা ঠোঁট আর কাটা নাক নিয়ে ডিকির সঙ্গে দেখা হলো সন্ধ্যাবেলা, প্রথম মুহূর্তেই তা ডিকির নজরে পড়তে ভুল হল না। ডিকি তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—কি হয়েছে? সেই মানুষখেকো কুমীরটা তোকে মেরেছে?

ডেভিড চুপ করে থাকল।

অসহিষ্ণু হয়ে ডিকি বললে—বল না, আমি যা বলছি তা ঠিক কি না!

ডেভিড আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে তাকে টানতে টানতে ডিকি বললে—আয় আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে ডেভিড বলল—কোথায় ?

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল ডিকি। রেগে বললে—কোন প্রশ্নের দরকার নেই। এখুনি আয় আমার সঙ্গে। আজকেই, এখুনি! আমি ঐ বুড়ো কুমীরকে আগে থেকেই জানি। অতি পাজি লোক। তোকে আগেই বলেছিলাম—তুই এমনি ওর সঙ্গে পারবি না। তোকে বক্সিং শিখতে হবে।

ডেভিড আর আপত্তি করলে না, বললে—চল্ কোথায় যাবি।

—এই তো ভাল ছেলের মত কথা। ওঠ, আমার সাইকেলের পিছনে ওঠ।

সাইকেলে যেতে যেতে ফুর্তিতে শিষ দি:ত লাগল ডিকি। বললে—জানিস, ঐ শয়তান আমাকেও একদিন মেরেছিল। সে অন্য কথা। এখন বক্সিং শেখ ভাল করে। তারপর দুটো স্ট্রেট কাট আর দুটো পাঞ্চ। ব্যস।

কিন্তু তা সত্বেও সে এগু্ সায়েবকে নিত্য নিয়মিত সেবা করার ও মাসাজ করে পরিতুষ্ট করার হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নি। দিনের পর দিন সে ডিকির সঙ্গে আখড়ায় গিয়ে বক্সিং শিখেছে, আবার সেই হাতেই এগু্র পদসেবা ও পৃষ্ঠদেশ মর্দনও করতে হয়েছে তাকে। না করলেই কোন না কোন অছিলা করে প্রহার। প্রহারে দু-একদিন বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল ডেভিড। কিন্তু তাতে ভল হয় নি। তাতে বরং প্রহারের ও নির্যাতনের পরিমাণ বেশী হয়েছিল। ঐ অতিকায় ক্রুর মানুষটার গায়ে [illegible] শক্তি। ওকে বাধা দেওয়া খুব কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু তার উপর এগু্ সায়েবের আক্রোশ প্রচণ্ড। কে জানে কেন। প্রথম থেকেই সে তাকে যে কি বিষ দৃষ্টিতে দেখেছিল! সামান্য সুযোগ পেলেই তাকে নির্যাতন করেছে। যখন সে সুযোগ পেত না তখন মাঝে মাঝে বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। সে দৃষ্টি সাপের এবং কুমীরের মতই স্থির, অর্থহীন অথচ অর্থবান, এবং ক্রুর।

শুধু তাই নয়। সে যেন তাকে সব দিক দিয়ে বিধ্বস্ত করবার জন্যে ছুতো খুঁজে বেড়াত। একদিন এমনি ছুতো খুঁজতে গিয়ে লেখাপড়া ছাড়িয়ে দিলে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডেভিড বাড়ী ফিরেছিল মাতাল হয়ে।

একটু দেরী করে ডেভিড যেমন ফেরে তেমনি রাত্রি করে ফিরতেই সে তার মাথার সামনের চুলের গোছা চেপে ধরেছিল বিনা বাক্যব্যয়ে।

—সোয়াইন! শুয়ার।

এই আকস্মিক নির্যাতন ও অপমানের মধ্যে পড়ে ডেভিড চীৎকার করে উঠেছিল—ছেড়ে দাও আমাকে।

—ছেড়ে দেব তোকে? বলতে বলতে এণ্ড্রু গোমেজ তাকে আরও দুটো ঝাঁকি দিয়েছিলে—ছেড়ে দেব তোকে? তুই তো একটা বেহেড মাতাল হয়েছিস। মদ খেয়ে একটা ছুঁড়ির কোমর ধরে যাচ্ছিলি। ও মেয়েটাকে আমি চিনি। পাজী মেয়ে।

একটা বেপরোয়া ভাব এসেছিল ডেভিডের মনের মধ্যে। শারীরিক নির্যাতনকে তুচ্ছ করে, মনে মনে আকস্মিক সাহসে বলীয়ান হয়ে সে বললে—তুমি কি করে মেয়েটাকে চিনলে? তুমিও বুঝি ওর কোমর ধরে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলে? মেয়েটা বুঝি আপত্তি করেছিল? সেই জন্যে মেয়েটা বুঝি পাজী?

বলাই বাহুল্য, এর পরে নির্যাতনের আর মাত্রা ছিল না। তারই মধ্যে এক সময় ডেভিড নিজের মাথাটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে। কতকগুলো চুল গোমেজ সাহেবের প্রকাণ্ড কঠিন থাবার মধ্যে রয়ে গেল।

গোমেজ আবার হাত বাড়াচ্ছিল তার দিকে। ততক্ষণে দুজনের মাঝখানে অ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। সে ব্যাকুল হয়ে বললে—করছ কি তুমি? কি করলে ডেভিড?

—ওকেই জিজ্ঞাসা কর বরং। কিন্তু তুমি শোন। আজ থেকে ওর লেখাপড়া বন্ধ।

ডেভিডের মাথার চুল বিপর্যস্ত, চোখ লাল, জামা ছেঁড়া জায়গায় জায়গায়। তারই মধ্যে সে বললে—তা হোক, তোকে আর আমার কথা ভাবতে হবে না। আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।

—যা, তাই যা। চীৎকার করে বললে গোমেজ সায়েব।

মায়ের কান্নায় ভ্রূক্ষেপ না করে সে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আর সেই সঙ্গে পুরানো জীবনের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিঁড়ে গেল একেবারে।

স্কুলে মাইনে লাগত না, ফ্রী ছিল। তবু ইস্কুল ছেড়ে দিলে সে। কি হবে লেখাপড়া করে? জুনিয়ার কেম্ব্রিজ আর একটা বছর পড়লেই হয়ে যেত! আর্টিস্ট হওয়াও তার ভাগ্যে নেই।

প্রথম রাত্রিটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাটিয়েছিল রাস্তায় রাস্তায়। স্পুক, স্পিরিট, গোস্ট—যাবতীয় ভূতের ভয় বুকে নিয়ে সে রাত্রিটা সে ভূতের মতই ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছিল। খাওয়া হয় নি, বিশ্রাম এবং নিদ্রাও না।

পকেটে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে পরদিন সকালে একখানা পাঁউরুটি আর খানিকটা চা খেয়েছিল। তারপর ঘুরতে আরম্ভ করেছিল চাকরির চেষ্টায়। অনেক ঘুরে চাকরি শেষ পর্যন্ত মিলেছিল একটা। মস্ত বড় এক মোটরের কারখানায় চাকরি। কাজ তো সে জানে না, তাই সামান্য মাইনে।

তারপর সেইখানে গাড়ির তলায় তেল আর কালি মেখে গাড়ির ইঞ্জিন সারাবার কাজ শিখে কাজ করতে করতে চারটে বছর কেটে গেল। এই চার বছরে মোটরের ইঞ্জিনের ভিতরে কোথায় কি গোলমাল তা এক নজরেই ধরতে শিখল সে। মাইনে পঁচিশ টাকা থেকে শুরু করে আজ আড়াইশো টাকা।

খাসা আছে সে। মোটামুটি ভাল পাড়ায় একখানা ঘর নিযে আছে। খায় সে হোটেলে। বছর কুড়ি বয়স, মাইনে আড়াইশো টাকা, আবার কি লাগে?

যে জীবনটা সে পেয়েছে সেখানে প্রচুর পরিশ্রম, যথেষ্ট আহার, যথেষ্ট বিহার নিয়ে পরমানন্দে থাকার কথা তার। তাই আছেও সে। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেশ কেটে যায়।

কিন্তু যে জীবন তার হয়নি, যে জীবন তার হবার কথা ছিল, যে জীবন তার হতে পারত সেই জীবন তার মনের কোন্ প্রান্তদেশে আজও লগ্ন হয়ে আছে গোধূলির মায়ার মত। এক দুরান্ত স্বপ্নের মত। সেখানকার রীতি পদ্ধতি আলাদা; সেখানকার বাক্য আলাদা। সেখানে তার প্রতিদিনকার জীবনের মত কুৎসিত অশ্লীল রসিকতা নেই, কর্কশ চীৎকার নেই, অলজ্জ, অকুণ্ঠ তরুণীর মত্ততা নেই।

সেখানে আকাশ কোমল মধুর, আশ্চর্য বর্ণে রঙীন। সেখানে জীবন অনেক নম্র, অনেক শুচি-শুভ্র। সেখানে দৃষ্টিতে অনেক লজ্জা, ভ্রূ-বিলাসে অনেক নম্রতা, বাক্যে অশেষ ধীরতা।

বাস্তবে এক জীবন যাপন করে, মনে মনে কিন্তু আর এক জীবনের তৃষ্ণায় সে তৃষ্ণার্ত। সে-জীবনকে সে দেখেছে নিজের পাশেই। কিন্তু সে-জীবনের বসতি তার কাছ থেকে অনেক দূরে।

সে-জীবনকে তার পাশ দিয়ে বিচিত্র নম্রতায় সে যেতে দেখেছে—কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রীলোকের বেশে। সেই দূরের সুন্দর জীবন অকস্মাৎ একদিন তার একান্ত কাছে এসে পড়ল। না, ভুল হল। সে-ই একদিন তার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

সেদিন ছিল শনিবারের বিকেল।

সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের অন্তে আনন্দময় আকাশ। কাজকর্ম শেষ করে ধীর মন্থর পদে অলসভাবে সে নিজের বাসার দিকে ফিরছিল। মনে মনে কল্পনা করছিল এই বিকেলটা সে কেমনভাবে অতিবাহিত করবে। বাড়িতে গিয়ে কিছু টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। তারপর চৌরঙ্গী এলাকায় কোন ছবিঘরে দুখানা টিকিট কেটে নেবে। কারখানায় বেরুবার আগে সে একবার স্টেটস্‌ম্যানের সিনেমার পাতাটা দেখে নিয়েছিল—কোথায় প্রচুর মারামারি এবং প্রচুরতর প্রেমের উত্তেজক ছবি চলছে। আজ ডোরাকে নিয়ে সেইখানেই সে যাবে। সিনেমা হলের অন্ধকারে দুজনে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসে সেই উত্তেজক ঘটনাবলী দেখার যে আনন্দ তা তারা উপভোগ করবে প্রাণ ভরে।

ধনী পাড়ার মধ্য দিয়ে পথ। পথের মধ্য দিয়ে দু-চারখানা গাড়ী নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। পথচারীর সংখ্যা অতি বিরল। বিকেলের ম্লান সুন্দর আলো অতি নিঃশব্দে মেঘহীন আকাশের শেষ বিদায়-মুহূর্তের নির্মল ব্যথিত হাসির মত মাটির বুকে বিছিয়ে আছে। যার অর্থ হয়তো ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তার আবেদন অন্তরে পৌঁছতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।

খানিকটা দূরে একটি মেয়ে দ্রুতপদে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। মেয়েটির বয়স বছর সতের-আঠারোর বেশী নয়। আর সে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর কন্যা। চলার ভঙ্গির স্বচ্ছন্দ দ্রুততার মধ্যে তার বয়সের প্রমাণ রয়েছে। ওর শরীর এখনও ভারী হয়নি, ও এখনও সহজেই ওর হাল্কা শরীরের ভার নিয়ে ছুটে যেতে পারে। দূর থেকেও সে যতটুকু দেখতে পাচ্ছে তাতে পরনের ফ্রকের শ্বেত পরিচ্ছন্নতায় মহার্ঘ্যতার আভাস। তার নীচে পায়ের নির্ভেজাল সাদা রঙে খাঁটি, মিশ্রণহীন বংশধারার প্রকাশ সুস্পষ্ট।

তার খানিকটা পিছনে একটি ছেলে খালি রাস্তায় এঁকে বেঁকে

মন্থরগতিতে সাইকেল নিয়ে চলেছে। সে বুঝলে মেয়েটিরই কোন বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত বন্ধু, নিজের জীবনের রাসলীলায় টানবার জন্তে তাকে অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু ও কি, মেয়েটির দ্রুত পদক্ষেপ দ্রুততর হয়ে উঠল যে!

এদিকে তার অনুসরণকারীর সাইকেলের গতিও সামান্ত বাড়ল।

সে গভীর কৌতুক অনুভব করলে। মেয়েটি হয় ধরা দেবে না ছেলেটি অবাঞ্ছিত বলে, না হয় লীলাভরে না চেনার ভান করে দ্রুত চলে ছলনা করছে ছেলেটির সঙ্গে। কিন্তু ছেলেটিও নাছোড়বান্দা। সে সাইকেল নিয়ে চলেছে তার পিছন পিছন।

ওতে তার রুচি নেই। সে কোন মেয়ের অনুসরণ করে না। মেয়েরাই বরং তার কাছে ছুটে আসে।

কিন্তু ও কি হল? মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল যে!

মেয়েটি ছেলেটির দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ছেলেটিও নেমে দাঁড়িয়েছে সাইকেল থেকে। কি কথা হচ্ছে ওদের শুনবার জন্তে সকৌতুক কৌতূহলেই সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

কিন্তু যা দেখলে তাতে অবাক হতে হল।

কোন লীলানন্দের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। মেয়েটি ফুটপাতের উপর এক বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বিপন্ন, অসহায় মুখে অনুসরণকারী তরুণের দিকে চেয়ে আছে। তার বড় বড় নীল দুই চোখের কানায় কানায় জল।

—তুমি কেন আমাকে এমন ভাবে 'ফলো' করছ?

ছেলেটি যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—তোমাকে 'ফলো' করছি? আশ্চর্য কথা তো! আমি তোমাকে চিনিই না!

—বেশ, চেনো না যখন তখন আর রাস্তায় আমার কাছে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যাও!

ছেলেটি এবার হাসল, বিচিত্র ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললে—কেন যাব? এ রাস্তা তো তোমার নয়! আমার ইচ্ছা আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

ডেভিড যেতে যেতে সবটা শুনলে। শুনলে সে এবং তাদের পার হয়ে চলে গেল। নিজেদের ঝগড়া ওরা নিজেরা ফয়সলা করুক, তার কি? কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে বিপন্নের আহ্বান এল—শুনুন!

সে ফিরে দাঁড়াল।

—দেখুন আমাকে কি ভাবে বিরক্ত করছে !

মন্থর পদক্ষেপে কাছে এসে ডেভিড একবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে নিলে। মেয়েটির তুষার-শ্বেত গালের উপর দিয়ে তখন চোখের জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে।

সে ধীরভাবে তরুণটির সামনে এসে দাড়াল। তারই বয়সী ছেলেটি। কাছে গিয়ে সে তাকে বললে—তুমি ওকে বিরক্ত না করে আস্তে আস্তে চলে যাও।

সেই আগের বেপরোয়া হাসি হেসে তরুণটি বললে—কেন যাব? আমি যাব 'ডেভিল' সেজে আর তুমি বুঝি 'হিরো'র পার্ট করবে?

—যাবে এই জন্যে। বলে সে অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে তার পাঁজরায় একটি ঘুঁসি মারলে।

ছেলেটি বসে পড়ল মার খেয়ে বুকে হাত দিয়ে।

—তোমার মুখে মারিনি ইচ্ছে করে। মারলে কি রকম লাগবে সেইটা বুঝিয়ে দিলাম কেবল।

ছেলেটি বিষদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠল। তারপর সাইকেল ধরে আস্তে আস্তে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—তোমাকে দেখব একদিন।

—দেখো! যত ইচ্ছে! বলে সে হেসে মেয়েটির দিকে মুখ ফেরালে। মেয়েটির মুখে তখন স্বস্তির অস্ফুট হাসি ফুটে উঠেছে। সে চোখের জল মুছছে।

এই সুন্দর ফুটফুটে চেহারার মেয়েটি সাদা লিলি ফুলের মত সুন্দর, নরম, পবিত্র হলে কি হবে, অন্যদিকে বোকা, ভীতু, ছিচকাঁদুনে। নিজের চেনা-জানা জায়গায় চেনা-জানা মানুষের মধ্যে ফুলদানিতে রাখা সাদা জুঁইচাপার মত জায়গাটা আলো করে রাখে, কিন্তু অপরিচিত পরিবেশে, অজানা মানুষের চোখের দৃষ্টির উত্তাপে একেবারে যেন ঝলসে নেতিয়ে পড়ে। এখনও চোখের জল মুছছে মেয়েটা। তার কেমন রাগ হয়ে গেল। সে খানিকটা ধমকের সুরে বললে—একা তো রাস্তায় চলাফেরা করতে ভয় পান। তা জেনে শুনেও গিয়েছিলেন কোথায় একা একা?

ধমক খেয়ে মেয়েটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। সে আরও খানিকটা পিছিয়ে ভয়ে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে তার দিকে ভয়ার্ত

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে বললে—আমি গানের লেসন্ নিতে গিয়েছিলাম। সপ্তাহে একদিন সেখানে যাই।

ডেভিডের ঠোঁট দুটো নিজের অজ্ঞাতে একবার বেঁকে গেল। ওঃ, accomplished হবার সাধনা চলেছে। ভাল ভদ্রঘরের মেয়ে কি না! বাবার বোধ হয় পয়সা আছে! তাই হয়তো ভাল ইস্কুলে, লরেটো কি ডায়োসেশনে লেখাপড়া শেখা চলছে। তার সঙ্গে খানিকটা ছবি আঁকা, খানিকটা গান! তার উপর বাড়িতে মায়ের গৃহস্থালীর শিক্ষা আছে। এটা কর, ওটা কর, এটা করতে নেই, ওটা করো না, ওখানে যেও না, ওর সঙ্গে মিশো না। না, না, না,—শুধু 'না'-এর শিক্ষায় এমনটা দাঁড়িয়েছে।

এর চেয়ে তার বান্ধবীরা অনেক ভাল। গান-বাজনা-ছবির ধার ধারে না। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে, ঝগড়াও করতে পারে, আবার বেতালা গান করে উল্লাস প্রকাশ করতে পারে। তারা জানে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে চেপে হোটেলে যেতে, তাকে হেসে, চোখের তির্যক দৃষ্টি দিয়ে খুশি করে তার পকেট কেটে পেট ভরে খেতে। নিজে খুশি হতে জানে, অন্যকেও খুশি করতে পারে।

—কোথায় থাকেন? রাগের রেশটা তার কণ্ঠ হতে তখনও যায়নি।

মেয়েটা বললে—কাছেই থাকি। এই একটা বাঁক ঘুরেই।

ডেভিড দেখলে মেয়েটিকে সে যতটা বোকা ভেবেছিল তা নয় মেয়েটা। বুদ্ধি আছে। কোথায় গিয়েছিল অথবা কোথায় থাকে একটা ঠিকানাও কিন্তু মেয়েটা ভুলেও বললে না!

ডেভিড আবার প্রশ্ন করলে—এগিয়ে দেবো?

মেয়েটি তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে একবার। বোধহয় তার চোখে খুঁজতে চাইলে এ সৌজন্যের আসল অর্থ কি! এ শুধু ভদ্রতা, না ঐ বিতাড়িত ছেলেটির মতই তার সঙ্গ নেবার ছল!

ডেভিড বললে—আপনার সঙ্গে যাবার আমার কোন আগ্রহ নেই। কেবল সেই সাইকেলওয়ালা যদি আপনার অপেক্ষায় কোন বাঁকে অপেক্ষা করে থেকে থাকে। এবার আপনাকে একা পেলে সে অপমান না করে ছাড়বে না। তাছাড়া সে বোধ হয় আপনার ঠিকানাও জানে!

মেয়েটি হাসতে লাগল। লজ্জিত হাসি হেসে বললে—না, না, তা বলিনি আমি। যদি আপনার কষ্ট না হয়, কাজের ক্ষতি না হয় তাহলে আমাকে একটু এগিয়ে দিন।

ভদ্রঘরের মেয়ে কি না! ভদ্রতা জানে খুব। কথা বলার কায়দা কত!

ডেভিড বললে—চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।

সারা পথ আর কোন কথা হল না দুজনে। মেয়েটির দিকেও সে আর তাকাতেও পারলে না। শুধু তার সন্নিকটে মেয়েটির অপরূপ অস্তিত্বের অনুভব তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখে দিলে। চলতে চলতে চোখ দিয়ে সে শুধু সামনেটা দেখলে আর সোজা অনুভব করলে মেয়েটি তার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে তার নিটোল মর্মরশুভ্র সোজা সরল পা দুখানি ফেলে সোজা হয়ে হেঁটে চলেছে। বিকেলের এলো-মেলো বাতাসে তার সাদা অর্গাণ্ডির ফ্রকের প্রান্তদেশ দুলে দুলে উঠছে। মেয়েটি কোন একটি অতি মৃদু মধুর গন্ধের পুষ্পসার মেখেছে, তারই গন্ধ অস্পষ্টভাবে নাকে লাগছে।

একবার সে প্রলুব্ধ হল। একবার ইচ্ছা হল মেয়েটিকে বলে—চল আমার সঙ্গে সিনেমায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংযত করে ফেললে সে।

পাশেই একটা পার্ক। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় নানান বিদেশী গাছপালার মধ্যে নরম, সবুজ, ঘাসের লনে সুন্দর জামা-কাপড়-পরা ছেলেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। আয়ারা বসে আছে কাছে কাছে। এই পড়ন্ত বেলা, এই গাছপালা আর সবুজ ঘাসের লন, এই শিশুদলের লীলাময় হাস্যবত ছবি একটি গভীর আনন্দময় শান্তির মত প্রতিভাত হল তার কাছে।

মেয়েটি অকস্মাৎ পার্কের পাশ দিয়ে ঘুরল। সেও ঘুরল সঙ্গে সঙ্গে।

মেয়েটি এবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হেসে বললে—আমি বাড়ি এসে গেছি। আপনি এবার যান। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

বলেই আর বাক্যব্যয় না করে ছুটতে আরম্ভ করল। ছোট বাচ্চার মত খানিকটা ছুটে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর হাসিমুখে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে চীৎকার করে বললে—বাই, বাই!

বলেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আর একটা বাঁকের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড। অনেকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে পার্কের ভিতর ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসল।

চোখের সামনে দিনের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসছে।

শিশুদের খেলা আর কলরব সাঙ্গ করে ঘরে ফিরবার জন্যে আয়ারা একে একে তাদের কোলে পুরে, হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গাছগুলির উজ্জল শোভা আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যচ্ছে।

সে চুপ করে শান্ত বিষণ্ণ আশ্চর্য সৌন্দর্যের অংশভাগী হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তার আর কিছুই করা হল না। কোন ফুর্তি না, কোন ভোগ না, কোন আনন্দ না। কেমন একটা বিষণ্ণতায় সারা মনটি যেন শান্ত নম্র হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে যেন কোন্ আশ্চর্য মহিমার ছায়া পড়ছে তার মনে।

॥ পাঁচ ॥
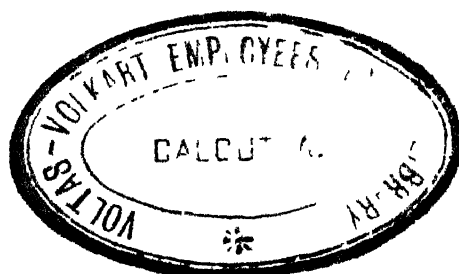
অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এল, যখন সবাই উঠে চলে গেল পার্ক থেকে, যখন মালী এল পার্কের দরজায় তালা দিতে, তখন সে উঠল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। ধীর পদক্ষেপে বাড়িতে ফিরে এল।

তারপর রবিবার সকালটাও চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকল সে। তার ফুর্তি কোথায় অন্তর্ধান করেছে। বার বার মেয়েটির সাদা ভুঁইচাপার মত সরল শুভ্র রূপটি মনে পড়ছে আর তারই আলোয় নিজের জীবনটার অশুচি চেহারাটা ভেসে উঠছে তার মনের মধ্যে।

তার বাড়িঘরের চেহারা দেখে, তার পোশাক দেখে তাকে কে বুঝবে! পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট, কোথাও এতটুকু নোংরা নেই। এর থেকে তো বুঝবার উপায নেই সে কারখানায় গিয়ে এই ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড়-গুলি সযত্নে খুলে রেখে নোংরা তেল কালি-মাখা জামা পরে গাড়ির তলায় ধুলো, কাদা, তেল-কালির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তেমনি তার তেল কালি-মাখা, কলঙ্কিত মনের চেহারাটা আর কেউ না জানুক তার নিজের তো অগোচর নাই। বিপুল অবসাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে রইল সে।

অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সে বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে বসল। কতকাল সে মাকে দেখেনি! সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজের কাজ শেষ করে জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল। আজ রবিবার, মা আজ নিশ্চয় চার্চে আসবে। সে গিয়ে সার্ভিস শেষ হবার আগে চার্চের রাস্তার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে রইল।

মাকে দেখতেও পেলে সে। মা একাই এসেছে। সেই বুড়ো ভণ্ড কুমীর আসে নি। মা কত রোগা হয়ে গিয়েছে। এই ক বছরে যেন মায়ের দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে!

সে দূর থেকে মাকে দেখে আবার ঘরে গিয়ে এল। আবার সেই অবসাদ! সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দুপুর বেলা তার ঘুম ভেঙে গেল ডিকির ডাকে। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এখন আরও বেড়েছে। একই কারখানায় কাজ করে দুজনে।

ডিকি ধাক্কা দিয়ে ডাকছে তাকে—এই ডেভিড, ওঠ! সিনেমার টিকিট কেটে এনেছি! ডোরা আর লুসি এসেছে সঙ্গে।

চোখ মেলে তাকিয়ে সে দেখলে ডিকির দু পাশে দুটি বিগাঢ়যৌবনা বান্ধবী হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বহু বিচিত্র আনন্দের আহ্বান তাদের দৃষ্টিতে।

সে ধড়মড় করে আবার উঠে বসল। জীবনে আবার নূতন সাড়া জেগেছে। সে তাদের সঙ্গে হাসিমুখে আবার বেরিয়ে পড়ল।

আবার সেই উচ্চকণ্ঠ আনন্দ, অতি রুচিকর মত্ততা সে বিমনা ভাবটি কাটতে আর কতক্ষণ লাগে! বর্ষার আকাশে মেঘ জমতে তো বেশী সময় লাগে না।

কিন্তু শনিবার বিকেলের মুখে সে আবার গিয়ে বসল সেই বাচ্চাদের পার্কে।

শিশুদের লীলা-চঞ্চলতার মধ্যে একখানা বেঞ্চিতে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার একটি অস্পষ্ট বিষণ্ণতা এক পুষ্পসারের মৃদু সুরভির মত সমস্ত মনে ছড়িয়ে পড়ল। সব কিছু কেমন অদ্ভুত রকম নরম নরম মনে হচ্ছে, সব ভাল লাগছে। কিন্তু এ ভাল-লাগায় কোন উত্তেজনা নেই। একটা মৃদু বিষাদ আছে যেন!

কিন্তু কৈ, সে তো আসছে না! চোখ যে তার ক্ষয়ে গেল! আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

বর্ষার দিন! আকাশে মেঘ জমে আসছে। এখনি হয়তো বৃষ্টি আসবে। তা হলে কি সে মিথ্যা বলেছিল তাকে?

অকস্মাৎ বুকটা দুলে উঠল।

ঐ তো আসছে! পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে হেঁটে চলে আসছে মেঘ-ছাওয়া দিনান্তের অস্পষ্ট আলো সর্বাঙ্গে নিয়ে। সেই দ্রুত সোজা চঞ্চল ভঙ্গি! ঋজুতা ও চঞ্চলতা দুই-ই আছে। সোজা চলে আসছে!

সে একবার ভাবলে উঠে দাঁড়াই। পার্ক থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওর চলার পথের সামনে দাঁড়াই। কিন্তু ভরসা করলে না। মনে হল তা হলে হয়তো সেই সাইকেলওয়ালাকে দেখে কেঁদে ফেলার মতই কেঁদে ফেলবে। কাজ নেই তাতে। সে বেঞ্চটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি তাকে দেখছে। দেখেও না দেখার ভান করে এগিয়ে চলে আসছে।

পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে কেবল একবার তার দিকে চাইল। একটু হাসলে। কিন্তু তার চলার গতি কমল না। চলতে চলতে একবার একটু হেসে পার্কের বাঁক ফিরল। তারপর সোজা চলে গেল এগিয়ে। আবার বাঁক ফিরবার মুখে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালে।

তাকেই দেখে নিলে নিশ্চয়। হাসলেও হয়তো একটু। এত দূর থেকে তা বোঝা গেল না। তারপর বাঁকের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমনি চলল কতদিন, কত শনিবার তার হিসাব নেই। কখনও দেখা পেয়েছে, কখনও পায়নি। দেখা মিললেও কখনও হয়তো দেখে হেসেছে; না হয় তার দিকে না তাকিয়ে, তাকে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছে।

তারপর একদিন।

এ প্রতীক্ষার পুরস্কার মিলল।

সেদিনও উপেক্ষাভরে তাকে না দেখার ভান করে চলে যেতে যেতে সে থমকে দাঁড়াল। ফিরল তার দিকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কেন আপনি এমন করে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রতি শনিবার বিকেলে?

কোন বান্ধবীর ক্ষেত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে চতুর হাসি হেসে সে চতুর জবাব দিত—তুমি তো জান, কেন দাঁড়িয়ে থাকি।

কি এ তো তাদের কেউ নয়!

এর তিরস্কার তো ছদ্ম কৌতুক নয়! এ তিরস্কারই। তাই তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে কোন জবাব দিতে পারলে না।

মেয়েটি আর অপেক্ষা না করে, আর না তাকিয়ে চলে গেল।

সে দাঁড়িয়ে রইল মার-খাওয়া মানুষের মত!

তার ফুর্তি যেন উপে গিয়েছে। মনের সব বাসনাও যেন কাটা ঘুড়ির মত ভাসতে ভাসতে কোথায় কোন্ দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাজে ফাঁকি দেবার মানুষ সে নয়। মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে। আর কাজ না করেই বা কি করবে? কাজ থেকে ছুটি নিলে অকারণ বিষণ্ণতা তাকে চেপে ধরবে। কাজের মধ্যে, বিশেষ করে এই হাতে-কলমের কাজে অখণ্ড মনযোগের প্রয়োজন হয় বলেই, কাজ করে এখানে ভুলে থাকার সুযোগ আছে।

তবু তাকে ঠিক ধরে ফেললে ডিকি। একটা গাড়ির তলা থেকে কাজ সেরে সে বেরিয়ে এসে ছেঁড়া গ্যাকড়ায় হাতের তেল, গ্রীজ মুছছে, ডিকি এসে তার পাশে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বললে—তোর কি হয়েছে রে ডেভিড?

ডেভিড চমকে উঠল, বললে—কই, কি হবে, কিছু হয়নি তো?

কিছু-হওয়াটাকে সে কেমন করে বলবে বন্ধুর কাছে? কি তার স্বরূপ? গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা আজ একটা মেয়ের জন্য তার মন কেমন করছে, বুক দুরদুর করছে এ কথা বলবে কেমন করে? আর এই অজস্র প্রতীক্ষার পরও যে মেয়েটা কথা বলেনি তার সঙ্গে, তারই জন্যে এই মনোভাব এটা বলারও যে অপরিমেয় লজ্জা! শুধু কি তাই? এর পিছনে তার অন্তরের যে তৃষ্ণার স্বরূপটি তার কাছে অস্পষ্ট হয়েও অনিবার্য তাকে তো ভেঙে বলতে পারে না ডিকিকে? আর বললেও সে তো বিশ্বাস করবে না!

তার হাসি দেখে ডিকি হাসল না, গম্ভীরভাবে বললে—তাহলে বলবি না কি হয়েছে? আচ্ছা বল্‌তে হবে না।

সে ডিকির হাতটা ধরে ফেলল। বললে—বলছি, বলছি। আয়, এইপাশে আয়!

কিন্তু বলতে গিয়েও সে কি লজ্জা!

তবু সে সব বললে ডিকিকে। নিজের মনোভাবটা বাদ দিয়ে ধারাবাহিক ঘটনাটা বন্ধুর কাছে বিবৃত করলে। সব শুনে ডিকি হাসলে না। গম্ভীর হয়ে বললে—তোকে দুটো কথা বলি, মন দিয়ে শোন। প্রথম কথা এই সব বাজে সেন্টিমেণ্টকে আমল দিস না। কারণ আমল দিয়ে সুবিধা হবে না। আর দ্বিতীয় কথা, ওই সব জেণ্টল-লেডিদের সঙ্গে, জেণ্টল্‌ম্যানের মেয়েদের সঙ্গে নিজেকে জড়ায় না। আমাদের ঐ হৈ চৈ ভাল, আমাদের ডোরা, লিসি, লুসিই ভাল। ট্যাক্সিতে চড়িয়ে, খানিকটা হোটেলে খাইয়ে, সিনেমা দেখিয়ে দিলেই দায় খালাস। তার ভিতরেই যা ফুর্তি হল তাই লাভ। তারপর আর সম্বন্ধও নাই, দায়ও নাই। ও সব সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাস না! তার চেয়ে বরং আজ সন্ধ্যায় সিনেমায় চল। খরচ আমার। কি, যাবি তো?

হেসে ডেভিড বললে—ঠিক বলেছিস! যাব!

কিন্তু মনে মনে সেই একই সঙ্গে ভাবলে—সেন্টিমেন্ট? যদি সেন্টিমেন্টই হবে তবে সে তা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না কেন? জীবনের কোন্ গভীর মর্মমূল থেকে উৎসারিত কোন্ দুর্নিবার তৃষ্ণার অনিবার্যতা বুকে নিয়ে সে ছুটে যায় সেই পার্কে তা কি সে নিজেই জানে? তার আগে সমস্ত সপ্তাহটা ধরে নিজেকে শাসন করে করেও স্থির রাখতে পারে না বলেই তো ছুটে যায় তবু একবার দেখবার জন্য।

তবু নিজেকে শাসন করে পর পর দু শনিবার আর সে গেল না পার্কে। তার বদলে অন্ধকার হলে বান্ধবী সঙ্গে নিয়ে সিনেমার পর্দায় ছবির খেলার দিকে চোখ রেখে বসে রইল। কিন্তু মনে মনে খালি ভেবেছিল অন্য কথা! বার বার ঘড়ির দিকে চোখ রেখেই অন্ধকারের ভিতর দেখবার চেষ্টা করছিল ক'টা বাজে। মনে বার বার সেই পার্কের ছবিটা ফুটে উঠেছিল। মনে হয়েছিল সেই সর্বশুক্লা সপ্তদশী চঞ্চল পদক্ষেপ, ঋজু সহজ ভঙ্গিতে নোটেশনের খাতা বুকে ধরে পার্কটা পার হয়ে চলে গেল। যাবার সময় একবার বেঞ্চটার দিকে হাসিমুখে চাইলে একটি পরিচিত মুখ দেখবার জন্য। কিন্তু দেখতে পেলে না। বেঞ্চে আজ সে মানুষ নাই, অন্য একদল মানুষ বসে আছে। অপরিচিত মানুষ দেখে, সে একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললে। তার পর বাঁক ফিরে চলে গেল।

ছবি দেখতে দেখতে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। পাশে বসেছিল ডোরা। সে লক্ষ্য করেছিল ডেভিডের অন্যমনস্কতা। সে তার চাঞ্চল্য দেখে অন্ধকারের মধ্যেই তার হাতখানা খুঁজে নিয়ে চেপে ধরে বলেছিল ফিসফিস করে—কি হল?

একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডেভিড তার হাতখানায় প্রবল চাপ দিয়ে ধরে রেখে আবার ছবির দিকে মন দেবার চেষ্টা করেছিল।

তার পরের শনিবার সে আর পারেনি।

আবার বুকে উগ্র তৃষ্ণা নিয়ে সেই বেঞ্চে গিয়ে বসেছিল শুধু তাকে একবার দেখবার জন্যে।

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর তার বুকের চেনা ধক্‌ধক্ আওয়াজ তাকে বুঝিয়ে দিলে যার জন্যে সে এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে সে আসছে।

সে উঠে দাঁড়াল রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

সে এল সেই চঞ্চল পদক্ষেপে, সেই ঋজু ভঙ্গিতে!

এসে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে ফুটপাথের উপর পার্কের

রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। নীল চোখের সহজ সরল দৃষ্টি তুলে তার দিকে তাকাল।

আস্তে আস্তে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। হেসে নরম গলায় বললে—দু শনিবার ছিলেন না কেন?

এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের সে কোন জবাব দিতে পারলে না। মিথুন-লীলাভিজ্ঞ চতুর তরুণ লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে। তার মুখে এ কথা জোগাল না যে, তুমি বারণ করেছিলে।

মেয়েটি সহাস্যে বললে—আসুন, আমাকে এগিয়ে দিন একটু।

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। তৃষ্ণার পানীয় ঠোঁটের প্রান্তলগ্ন হল যেন। সে শুধু বলতে পারলে—চলুন।

তারপর বহুদিন আগে যেমন করে একদিন পার্কের ধার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে পার্কের ধার থেকে আবার তার যাত্রা শুরু হল।

কিন্তু বেশী দূর নয়। একটা বাঁক মাত্র।

দ্বিতীয় বাঁকের মাথায় এসে মেয়েটি বললে—আমি যাই এবার।

পাশের বাড়িটি দেখিয়ে ডেভিড জিজ্ঞাসা করলে—এই বাড়ি নাকি?

মেয়েটি হেসে বললে—না, ঐ একটু দূরে। ঐ যে লাল বাড়িটা! চোদ্দর দুই! অতদূর আর যেতে হবে না। ওখানে গেলে বাবা লাঠি দিয়ে মারবে। বাবা খুব রাগী মানুষ।

বলে মেয়েটি হাসতে লাগল গভীর কৌতুকের সঙ্গে।

ডেভিড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এ হাসি সে আর কখনও কারও মুখে দেখেনি। মেয়েটির রঙ সাদা, পোশাক সাদা, ঠোঁট দুটিতেও রক্তিমতার পরিমাণ কম। মুখে কোন রুজ-লিপস্টিকের চিহ্ন নাই। অনেকটা যেন 'নান'দের মত। তবু তার মুখে হাসিটি ভুঁইচাঁপা-ফুলের প্রসন্নতার মতই ফুটে উঠেছে। এ হাসিতে শুধু আনন্দ আর কৌতুকই আছে। তার অতিরিক্ত কোন গূঢ় অর্থ বা ব্যঞ্জনা নাই সেখানে। সহজ সরল হাসি ঠোঁটের দুই প্রান্ত থেকে দুই নীল চোখের কোণ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এ হাসি মনে কোন কামনার আবেশ আনে না, শুধু একটি শুভ্র আনন্দের স্পর্শ বহন করে আনে।

ডেভিড আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার নাম?

—নাম? আমার নাম সুসান স্টকডেল।

—কোথায় গান শিখতে যান শনিবারে?

সকৌতুক হাসি হেসে মেয়েটি বললে—বলব না! একদিনে সব জেনে নেবেন, এ কি হয়?

বলে হাসতে লাগল মেয়েটি।

ডেভিড অনুভব করলে এ হাসি, এ কৌতুক কোন পরিণতমনা তরুণীর নয়, এর মধ্যে শৈশবের চিহ্ন এখনও অপসৃত হয়ে যায়নি। একেই বোধ হয় কৈশোর বলে।

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডেভিডও দাঁড়িয়ে গেল।

সুসান বললে—এইবারে যান! গুড বাই!

এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠল ডেভিডের মুখে! সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—আসছে শনিবার দেখা হবে তো? মেয়েটি যেন রাগ করেই জবাব দিলে—জানি না!

বলেই আর কোন কথার অপেক্ষা না রেখে ছুটতে আরম্ভ করলে। খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে হেসে হাত নেড়ে বললে—বাই, বাই!

তারপরই সে লাল বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনে সুগভীর এক তৃপ্তির আস্বাদ নিয়ে ফিরল ডেভিড!

তারপর।

ডেভিডের জীবনে সে আশ্চর্য একটি অধ্যায়।

তার পরের শনিবার দেখা হতেই ডেভিড বললে—আজ সোজা পথ দিয়ে বাড়ি না গিয়ে একটু ঘুরে ঐ পথটা দিয়ে চলুন না!

সুসান তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। তারপর বললে—চলুন। কিন্তু কেন?

এ কেনর জবাব ডেভিড দিতে পারত। কিন্তু তার শুভ্র হাস্যোচ্ছল মুখের দিকে চেয়ে বললে—এমনি।

তারা পিছিয়ে ঘুরে একটা বড় রাস্তায় ঢুকল। পথে একটিও পথচারী নেই, মাঝে মাঝে এক-আধখানা গাড়ি ছুটন্ত চাকায় পথের উপর একটা শিরশিরে শব্দ তুলে বিদ্যুৎগতিতে চলে যাচ্ছে। পথের দু পাশে বড় বড় গাছ দু ধার হতে পথের উপর ছায়ার আস্তরণ পেতেছে। শ্যামল, কোমল, শান্ত, নিভৃত ছায়ার কোলে কোলে তারা আস্তে আস্তে চলল। সুসানের স্বভাব-চঞ্চল পায়ের চলা আজ মন্থর হয়ে এসেছে।

তার পাশে পাশে চলতে চলতে ডেভিড বললে—আমরা চলব বলেই রাস্তাটি এমনি ছায়ানিবিড়, এমনি জনবিরল। সুসান থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চোখে তার বিচিত্র সকৌতুক দীপ্তি ফুটে উঠেছে। সে তার তর্জনী তুলে বলে উঠল—বুঝেছি!

—কি?

—আপনি কবি।

একটু ম্লান হাসি হাসল ডেভিড। বললে—আমি কবি হলে নিশ্চয় খুব সুখী হতাম। কিন্তু আমি কবি নই; কবিতা লেখা দূরে থাকুক, কবিতা বুঝতেও পারি না।

—তবে কি করে বললেন অমন কথা?

ডেভিড হাসল। হেসে বললে—আপনিই আমার ভিতর থেকে বের করে এনেছেন কথাগুলি। আপনার সান্নিধ্যের জন্যে এমন হয়েছে।

সুসান ঘাড় নেড়ে সজোরে বললে—নাঃ।

ডেভিড বললে—আপনাকে দেখে আমার 'লুসি'কে মনে পড়ছে!

সুসানের চোখে বিদ্যুৎ চমকে গেল—লুসি? কে লুসি?

—মানুষ লুসি নয়! কবিতায় লুসি:

A violet by a mossy stone
Half-hidden from the eye!
Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.

খুশিতে জ্বলে উঠল সুসান—বাঃ! কে বলে আপনি কবিতা জানেন না! এই তো।

হেসে ডেভিড বললে—ওর বেশী আর না!

ছোট শিশুর মত মাথা নেড়ে সুসান বললে—আমি মানি না।

—আমি কবি নই, আমি—। বলে থেমে গেল ডেভিড। তারপর আবার বললে—বললে আপনি খুশি হবেন কি না জানি না। তবু বলি আমি সামান্য কারিগর।

—তাতে কি? কারিগরও অনায়াসে কবি হতে পারে।

ডেভিড প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, আপনি তো গান শেখেন! ছবি আঁকতে পারেন না?

—শিখি অল্প অল্প! বাড়িতে প্রতি শুক্রবার মাস্টার আসেন শেখাতে।

—আমি এক সময় ছবি আঁকা শিখতাম, আঁকতেও পারতাম।

সুসানের সে কি আনন্দ! বললে—বাঃ, আপনি ছবি আঁকতে পারেন?

রাস্তার বাঁক ফেরার সময় এসেছে।

বাঁকের মাথায় এসেই থমকে দাঁড়াল সুসান।

ডেভিডও দাঁড়িয়ে গেল। হেসে জিজ্ঞাসা করলে—যেতে হবে বুঝি এবার?

—হ্যাঁ। চললাম। আবার আসছে শনিবারে দেখা হবে।

বলে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল সুসান। একবার থমকে হাত নেড়ে কেবল এক ঝলক হাসি ছিটিয়ে দিয়ে গেল।

তৃপ্ত ডেভিড সেইখানে হাসিমুখে, সুসানের মুখের হাসিটি নীলাকাশ-স্খলিত জ্যোৎস্নার মত, কোনও মহার্ঘ্য অলঙ্কারের মত হৃদয়ে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার তার গোটা জীবনটাই বদলে যেতে আরম্ভ করেছে যেন!

একটা আশ্চর্য জগতে প্রবেশের সিংহদ্বার যেন তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। সেই দেশে আনাগোনা করার রীতি-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার সবই যেন স্বতন্ত্র।

তার আর দল বেঁধে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে হোটেল কি সিনেমায় যাবার সময় হয় না। ডিকিও তাকে বেশ কায়দা করতে পারে নি। তার যে একটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা ডিকির নজরে পড়েছে। কিন্তু কিছুই বলেনি সে ডেভিডকে। একটা রবিবার সকালে ডেভিডের ঘরে সে এসে হাজির হল।

ডিকির এ আবির্ভাব ডেভিড প্রত্যাশা করেনি। সে হাতের কাগজ-পত্র সরাতে, চাপা দিতে দিতে বললে—কিরে, রবিবার সকালে যে?

—এলাম। বলে ডিকি একখানা চেয়ারে গম্ভীরভাবে চেপে বসল।

তারপর তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—কি, করছিলি কি?

অপ্রস্তুত লজ্জিত হাসি হেসে ডেভিড বললে—কিছু না, এমনি আর কি!

—কি এমনি? কিছু নয় মানে! তোর চারিপাশে জল, তুলি, রঙ ছড়ানো দেখছি! ছবি আঁকছিলি না কি?

—না, না, ও কিছু নয়!

ডিকি আর কিছু বললে না। উঠে ঘরের চারিদিকে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে এসে দাঁড়াল আলমারির পাশে। সেলফের বইগুলি নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। ক'খানা মোটর-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক'খানা কবিতার বই। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, বার্নসের রচনাবলী।

দেখে বিচিত্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ডিকি।

—কি ব্যাপার, তুই কি আবার ইস্কুল কলেজে ভর্তি হবার তালে আছিস না কি?

ডেভিড সবটা হেসে ওড়াবার জন্যে বললে—আরে না না। কখানা বই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকানে, চৌরঙ্গীতে, খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। তাই নিয়ে এলাম।

—হুঁ! বলে আর কিছু বললে না ডিকি। আবার চেয়ারে এসে চুপ করে বসে তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

ডেভিড হেসে বললে অস্বস্তির সঙ্গে—তুই কি দেখছিস বল তো দেখি? তুই যা দেখছিস তার মধ্যে যেন কিছু খুঁজছিস!

ডিকি কোন জবাব দিলে না। চেয়ারে চুপ করে বসে ছিল। বসেই থাকল।

অকস্মাৎ এক সময় চেয়ারটা তার কাছে সরিয়ে একান্ত কাছে বসে তার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আমার একটা অনুরোধ আছে। রাখবি?

তার ধরন দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল ডেভিড। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় হেসে বললে—এ কি বলছিস? নিশ্চয় রাখব, বল।

—তুই আমার সঙ্গে সেই মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিবি?

ডেভিড যেন আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হয়ে বললে—কি বলছিস তুই? কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব? মনে মনে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

ডিকি গভীর প্রত্যয় ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে—কার সঙ্গে তা তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস! আলাপ করিয়ে দিবি না তাই বল।

ধরা-পড়ে-যাওয়া মানুষের মত অপ্রস্তুত হাসি হাসতে লাগল ডেভিড।

হাসতে হাসতে সে বললে—কি যে বলিস তুই তার ঠিক নেই। আমার সঙ্গেই ভাল করে আলাপ নেই তা তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব কি?

আলাপ করিয়ে দেবার মত পরিচয় সুসানের সঙ্গে তার নাই। আর তা থাকলেও সে ডিকির সঙ্গে তার আলাপ কোনমতেই করিয়ে দেবে না! সুসানকে তাদের জীবনের পাঁকের মধ্যে সে টেনে আনবে না কিছুতেই। ডিকি কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে জেদ করে বললে—বেশ, আলাপ করিয়ে না দিস একবার দেখতে পাব তো তাকে?

ডেভিডকে রাজী হতে হল। সে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ত বললে—বেশ, তা দেখাব। তোকে জায়গা আর সময় বলে দেব। সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি, তা হলেই দেখতে পাবি!

ডিকি তার পিঠে একটা চপেটাঘাত করে গম্ভীরমুখে উঠে দাঁড়াল।

—এই তো ঠিক ভাল ছেলের মত কথা!

তারপর রসিকতায় সরস করে বললে—দেখি সে কেমন মেয়ে, কত সুন্দর, যার জন্যে তুই তোর সব পুরানো অভ্যেস ছাড়বার চেষ্টায় আছিস! সে তোকে হোটেলে যাওয়া আর সিনেমা দেখা ছাড়িয়ে কবিতা পড়া আর ছবি আঁকা ধরিয়েছে!

আবার একটা চপেটাঘাত করে বললে—তুই বসে ছবি আঁক! আমি চলি! কিন্তু কি আঁকছিস আমাকে তো দেখালি না! সেই মেয়েটির মুখ আঁকছিস বুঝি!

ডেভিড হেসে টেবিলের উপর থেকে একখানা উলটো বোর্ড সোজা করে দেখালে।

একটা রাস্তার ছবি। জনবিরল, ছায়াচ্ছন্ন বীথিপথ। সামনে থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছে। সুদূর পথের অন্তিম প্রান্তে, ছায়া পার হয়ে, আলো আর আলো।

—কেমন হয়েছে রে?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডিকি বললে—বেশ হয়েছে তো! কিন্তু এটা কোন্ রাস্তা?

ডেভিড হেসে বললে—কোনও বিশেষ রাস্তা নয়, একটা রাস্তা!

ডিকি বললে—এই রাস্তা দিয়ে হাঁটিস বুঝি দুজনে?

—হাঁটি না, হাঁটতে ইচ্ছে করে।

ডিকি চলে গেল।

পরের সোমবারে যখন কারখানায় দেখা হল আবার ডিকির সঙ্গে, তখন ডিকি বললে—কনগ্র্যাচুলেশনস। সি ইজ এ ভেরী ফাইন থিং। তবে একেবারে সাদা জলের রঙের ঠাণ্ডা শরবত। কোন রঙও নেই, তাতও নেই।

ডেভিড তৃপ্তির হাসি হেসেছিল।

তারপরের কালটা তার জন্মান্তরের কাল। যে অভিজ্ঞতায় খালি সুখ আর আরেশ।

ডেভিডের মনে সেই আনন্দিত আবেশের অভিজ্ঞতার কোন পূর্বাপর ইতিহাস নাই। আর সে ইতিহাসের মধ্যে দ্বিতীয় কোন মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে তার সুর এক। সুরের বদল ঘটে নি কোনদিন।

কেমন করে সুসানের সঙ্গে সন্তর্পিত পরিচয় গাঢ় ঘনিষ্ঠ প্রেমে পরিণতি লাভ করেছিল তার ইতিহাস ডেভিড আমাকে দিতে পারেনি। তবু তার টুকরো কথা থেকে যতটা পেরেছিলাম আমি গেঁথেছি।

গ্রীষ্মের দিনে প্রখর রৌদ্রে সারা শহরটা যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তারা মিলিত হয়েছে। চৌরঙ্গী কি তার আশে-পাশে সাহেব-পাড়ায় কোথাও একটি নির্দিষ্ট হোটেলে বিশেষ সময়ে তারই জন্যে অপেক্ষা করে থেকেছে ডেভিড। খসখসে ঢাকা ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে পাখার তলায়। টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে খালি চেয়ার, দরজা আর ঘড়ির দিকে উৎকণ্ঠ দৃষ্টি রেখে বসে থেকেছে সে। হয়তো দেওয়ালে ক্লক ঘড়ির সোনালী কাঁটায় উৎকণ্ঠার দৃষ্টি তার আটকে গিয়েছে, সেই অবসরে সুসান এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। সমস্ত মুখখানি ঘামে আর হাসিতে ভেজা, উত্তাপে আরক্ত। তার দিকে তাকিয়ে নিজের ছোট্ট সাদা রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে হাসছে।

চোখাচোখি হতেই হেসে বলেছে—আর ঘড়ি দেখতে হবে না, এসে গেছি।

নিশ্চিন্ত হয়ে ডেভিড বলেছে—কে বলেছে ঘড়ি দেখছিলাম? আর যদি ঘড়িই দেখছিলাম কে বলেছে যে তোমার জন্যেই ঘড়ি দেখছিলাম?

চেয়ারে বসতে বসতে সুসান বলেছে—বেশ কথা, ধরে নিলাম

তুমি শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সেখানে মনে মনে আমার ছবিও আঁকছিলে!

শুনতে শুনতে ডেভিডের চোখে আনন্দে জল এসে পড়ত।

সেটুকু লক্ষ্য করে সুসানের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে মুখখানা কেমন হয়ে যেত যেন। যেন কত কত অজানা দুঃখ সে দু হাত দিয়ে, দু হাত ভরে নিজের বুকে আদর করে ধারণ করেছে।

ডেভিড হাসতে হাসতে বলত—বল কি খাবে?

হেসে সুসান বলত ঘাড় নেড়ে—কিছু না।

—তা কি হয়? কিছু না খেলে এখানে বসতে দেবে কেন?

—আমার হয়ে তুমি খাও।

—তা কি হয়? বল কি খাবে?

তার পীড়াপীড়িতে অস্থির হয়ে সুসান বলত—একটা কোল্ড্ ড্রিঙ্ক।

—ব্যস? আর কিছু না?

—না। তুমি খাও।

সুসান কখনও তার সঙ্গে চা, কোল্ড ড্রিঙ্ক, কি এক কাপ কফি ছাড়া কখনও কিছু খায় নি। তার লক্ষ অনুরোধ সত্ত্বেও কখনও খায় নি। সে খায় নি বলেই তো ডেভিডকে তার খাওয়াটা খেতে হয়েছে। ডেভিড খেয়েছে চপ-কাটলেট, আর তার সামনে শুধু এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে হাসিমুখে স্ট্রটা মুখে নিয়ে তারই মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থেকেছে।

একখানা হাত টেবিলের কাঁচের উপর হয়তো অবিন্যস্তভাবে রাখা।

ডেভিড খাবার অবসরে একবার তার সরল হাসি-হাসি মুখের দিকে একবার তার ছ ইঞ্চিরও কম দূরে এলানো হাতখানির দিকে নজর দেয়। ইচ্ছা হয় তার পরিচ্ছন্ন, শ্বেতশুভ্র, অনুরঞ্জনহীন আঙুলগুলির নিটোল মাথাগুলি পরম আদরে একবার ছুঁয়ে দেয়।

কিন্তু পরম শ্রদ্ধায় সে বিরত থাকে। শুধু দেখে, চেয়ে দেখে।

সামনাসামনি বসে দুজনে এলোমেলো গল্প করে খানিকটা, তারপর পিছনের ঘড়িতে একটা সশব্দ সময়-সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে সুসান উঠে দাঁড়ায়। বলে—চল এইবার।

তারপর হয় ট্যাক্সি, নয় রিক্সা।

তাকে তার বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে মন্থর পদক্ষেপে

আপনার বাড়ির দিকে চলে। চারিপাশ সম্পর্কে উদাসীন, আত্মগত। মনের মধ্যে অপরিমেয় সুখের স্মৃতিকে রোমন্থন করতে করতে আপনার কাজের মধ্যে ফিরে আসে।

কাজ নয়, অকাজ। কবিতা আর ছবি, ছবি আর কবিতা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে পরিকল্পনা করে পরদিন তার সঙ্গে আবার কেমনভাবে সাক্ষাৎ হবে।

কলকাতার আকাশ তামাটে উত্তপ্ত অবস্থা থেকে একদিন ঘনশ্যাম হয়ে ওঠে। মাটিতে শ্যাম ছায়া পড়ে, কালো মেঘ ভেঙে কণায় কণায় বৃষ্টির চেহারা নিয়ে দুরন্ত দুর্বার একদল শিশুর মত মাটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেদিনও হোটেলের টেবিলে ডেভিডের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় না। বর্ষাতিতে সর্বাঙ্গ মুড়ে মুখে সমান হাসি নিয়ে সুসান এসে হাজির হয়। ওয়াটারপ্রুফ খুলতে খুলতে বলে—বাবা কি বৃষ্টি!

চেয়ারে বসতে বসতে বলে—আমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে।

—কেন?

—আমার একজন রাগী, বদমেজাজী বাবা আছে ভুলে গেলে নাকি?

—না। বেশ, কি খাবে বল।

হেসে সুসান বলে—শুধু এক কাপ চা।

জোর করে ডেভিড বলে—শুধু চা কেন, আর কিছু খাও।

সুসান কোন জবাব দেয় না, শুধু হাসে। ও হাসির অর্থ ডেভিড জানে। ওকে ঐ স্বল্পতম জিনিসটুকু ছাড়া আর কিছু খাওয়ানো যাবে না। যেটুকু তার কাছ থেকে না নিলে নয়, সেটুকুই নেবে সুসান তার কাছ থেকে। তার চেয়ে বেশী কিছু নেবে না।

সুসানের সেই না-নেওয়ার মধ্যে কোথাও কিন্তু কোন অহংকারের খোঁচা থাকে না। আর সেই না-নেওয়াটা এমন সহজ সুন্দরভাবে ও মানিয়ে নেয়! হাসে আর বলে—আমি বাইরে কিছু খাই না। চা, কফি কি কোন কোল্ড ড্রিঙ্ক যে খাই তাও শুধু তোমার জন্যে। অন্য কিছু খেলে আমার শরীর খারাপ করে।

বর্ষা পার হয়ে শরৎ আসতেই আকাশ যেমনি পরিষ্কার হয়ে আসে অমনি হোটেলের বন্ধ ঘরে দেখা হওয়ার কাল শেষ হয়। তখন রৌদ্রা-লোকিত প্রান্তরের মধ্যে একটি নিরিবিলি জায়গা বেছে ওরা বসে।

মাঠে সতেজ হরিৎঘাসের গালিচার মাঝে মাঝে সাদা ফুলের কাজ করা। মাথার উপর নানান রঙ ধরানো মেঘের মেলা! তারই মাঝখানে দুটি মানুষের মনের সব কথা যেন চারিপাশে ঘাস হয়ে, ফুল হয়ে, মেঘ হয়ে ছড়িয়ে থাকে। তাই তারা বসে থাকে চুপচাপ। কথা বলার প্রয়োজন ঘটে না।

সুসানের মনেও ঋতু-বদলের পালা শুরু হয়েছে। যে হাসি তার মুখে ফুটবার আগেই চঞ্চল অবাধ্যতায় চোখের নীলাভায় উজ্জ্বল দীপ্তি হয়ে প্রকাশ পেত সেই হাসি এখন মনের গভীরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ভালবাসার যে নিজস্ব দুঃখ, নিজস্ব মহিমা আছে সেই দুঃখে সুসান মন্থর ও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। এখন আর সোজা সামনের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না ; মুখে বিশ্বসংসারকে প্রচ্ছন্ন ছবিতে দেখার অর্থহীন, অস্ফুট হাসি নিয়ে, ঋজু চঞ্চল পদক্ষেপে আর হাঁটে না, হাঁটতে পারে না। এখন হাসির সঙ্গে বিষণ্নতা এসে মিশেছে, চোখের দৃষ্টি নমিত হয়েছে, পদক্ষেপ ভার-মন্থর। শরীর আগে ছিল ঋজু, ছিপছিপে বেতের মত। এখন একটু ভারী হয়েছে। সংসারের প্রথম কঠিন অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাওয়ার আশ্চর্য আস্বাদে সে কেমন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

কে বলে প্রেমের আস্বাদ মধুর মত? প্রেমে কোন মাধুর্যের আস্বাদ নাই! প্রেমের অভিজ্ঞতায় আছে এক অতি তীক্ষ্ণ তীব্রতার আস্বাদ। সেই তীক্ষ্ণ অনুভবের পরিণাম মাদকতা। আর সব কিছুর সঙ্গে এক বিষণ্নতা মিশে আছে পরতে পরতে।

মাথা নীচু করে ঘাসের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে সুসান শুনতে পায়, ডেভিড মৃদুস্বরে তার নাম ধরে ডাকছে—সুসান!

মুখ না তুলেই সবুজ মখমলের মত ঘাসের উপর হাত বুলোতে বুলোতে সাড়া দেয়—উঁ?

—কিছু না, এমনি! এমনি তোমার নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে হল!

সুসান তার কথা শুনে একবার নিজের ধূসর, স্বপ্নালু দৃষ্টি তার মুখের উপর রাখলে। কেবল একটি হাসি তার মুখে ফুটে উঠল।

—আচ্ছা সুসান, তোমার বাবা জানেন তুমি এইরকম ভাবে আমার সঙ্গে মেশ?

সুসানের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে মুখে একটি ক্লেশের ছায়া পড়ল। সে বললে—না।

—তবে ?

—কি তবে ?

—কি করে আস ?

তার মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে সুসান আস্তে আস্তে বলল—না জানিয়ে আসি। নানান কাজের ছুতো করে আসি। বাবা আমাকে খুব বিশ্বাস করেন তাই রক্ষা !

তার ক্লেশটুকু অনুভব করে ডেভিড ম্লান হেসে বললে—তোমার মিথ্যে বলতে খুব কষ্ট হয়, না ?

—তা হয়। কিন্তু উপায় কি তাছাড়া ?

ডেভিড চুপ করে যায়। সুসান তার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে। ডেভিড ঘাসের উপর লম্বালম্বি শুয়ে পড়ে কতকগুলো সাদা ফুল সমেত ঘাসের শিষ হাত বাড়িয়ে তুলে আলগোছে তার চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়।

সুসান ফুলগুলি সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়ে বলে—দূর্ !

—আমার দেওয়া ফুলগুলো ফেলে দিলে ?

নিজের হাতে ফেলে-দেওয়া ফুলগুলি আবার একটি একটি করে সযত্নে তুলতে তুলতে সুসান হেসে বললে—ফেলে না দিয়ে তুমি যেমন দিয়েছিলে তেমনি মাথায় গুঁজে যদি বাড়ি যেতে পারতাম তবে আমার চেয়ে সুখী কে হত ?

এর কোন উত্তর নেই।

এটা একটা প্রশ্নই।

সেই প্রশ্নের সামনাসামনি একদিন দাঁড়াতে হল দুজনকে।

সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে ডেভিডের।

জানুয়ারী মাসের শীত-তীক্ষ্ণ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। ছুটির দিন।

সায়েবপাড়ার অভিজাত পল্লীর এক জনবিরল, গাছে-ঢাকা পথ দিয়ে চলেছিল দুজনে। নানান গাছের সঙ্গে পথের দুধারে গুলমোর, খসমস আর ফুল-শিরীষের সমারোহ। ফুল-শিরীষের বড় বড় গাছগুলি পাতায় ঘনশ্যাম। কিন্তু গুলমোর আর খসমসের সব পাতা ঝরে গিয়েছে। তার বদলে গৈরিক আর হলুদ ফুলে রাস্তার দু পাশ ঝলমল করছে। মাঝে মাঝে ফুলের পাপড়ি তীব্র বাতাসের কাঁপনে টুপটাপ করে একটি আধটি ঝরে পড়ছে।

একটি গুলমোরের গাছের তলা দিয়ে যাবার সময় সুসানের সাদা জামার ফ্রিলে গুলমোরের রক্তিম একটি ছুটি পাপড়ি খসে পড়ে আটকে গেল।

ঝেড়ে ফেলবার জন্যে সুসান হাত তুলতেই ডেভিড হাঁ হাঁ করে উঠল—থাক, থাক, ফেল না, ফেল না, থাকুক।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে হাত নামিয়ে নিলে সুসান।

ডেভিড বললে—ঐ ফুলটা জামার ফ্রিলে অমনি লেগে থাকুক। ওটা জামায় লেগে থাকলে তো তোমাকে বাড়িতে বাবার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমার ভালবাসার চিহ্নের মতো থাকুক ঐ লাল ফুলের টুকরোটা।

তারপর সুসানের মুখের দিকে তাকিয়ে ডেভিড বললে—কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলবে সুসান?

এ প্রশ্ন তো সুসানের মনেও ছিল। সুসান চকিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। তারপর একটু হেসে বললে—তোমার এত ভাবনা কেন বল তো?

—তুমি ভাবতে বারণ করছ? কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করলে ডেভিড।

সুসান সে কথার জবাব না দিয়ে বললে—তোমার কত বয়স হল ডেভিড?

—একুশ বছর। এই ডিসেম্বরে একুশে পড়েছি।

—তুমি কত মাইনে পাও?

—ছুশো পঁচাশি টাকা।

—ভাল। আমি হিসেব করে দেখেছি ভদ্রভাবে তিনজনের সংসার চালাতে খরচ লাগবে সাড়ে চারশো টাকা।

ডেভিড বললে—তা হলে?

সুসান হেসে বললে—তা হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তোমার মাইনে যতক্ষণ আরও একশো পঁয়ষট্টি টাকা না বাড়ে। না হলে—

ডেভিডের মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। সে সুসানের শেষ কথাটাই আবার প্রশ্ন হিসেবে পুনরুক্তি করলে—না হলে?

সুসান হেসে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে বললে—না হলে আর কি হবে? বিয়ে হবে না! আর না হলে আমাকে ছুশো টাকা উপার্জন করতে হবে।

ডেভিডের মুখের বিবর্ণতা আস্তে আস্তে কেটে গেল। তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা কৌতুক অনুভব করতে করতে সুসান বললে—তুমি না হয় আমার রূপ দেখে ভুলেছ। কিন্তু অন্য কেউ তো আমার রূপ দেখে ভুলে মাসে মাসে দুশো টাকা করে দেবে না! তার জন্য আমাকে পরীক্ষাটা পাস করে চাকরি করতে হবে। আর একটা দেড়টা বছর অপেক্ষা কর। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমি দুজনে চাকরি করব। স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যাবে। এখন একদম চঞ্চল হয়ো না!

ডেভিডের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

বাইরের পৃথিবী আবার পরম রূপময়ী হয়ে হাসতে আরম্ভ করেছে! শীতের তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা বাতাস পৃথিবীর স্নেহস্পর্শের মত মনে হচ্ছে। রৌদ্র আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! গুলমোরের পুষ্পস্তবককে স্তম্ভিত অগ্নিপিণ্ডের মত মনে হচ্ছে, খসমসের হলুদ রঙ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে যেন। পৃথিবীর আবেগ যেন আজ পুষ্পস্তবকে স্তবকে স্তম্ভিত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একবার মৃদু কোমল সুরে ডেভিড ডাকলে—সুসান!

—বল। প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিলে।

সকাতর, গভীর আন্তরিক প্রার্থনার মত ডেভিড আস্তে আস্তে বললে—তোমার হাতটা একবার ছোঁব?

গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে সুসান আপনার একখানা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলে। পরিচ্ছন্ন হাতের শুভ্র, অনুরঞ্জনহীন, নিটোল এক স্তবক আঙুল।

পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট দুর্লভতম সামগ্রীর মত অতি সন্তর্পণে সে তার আঙুলগুলি কোমল আলতোভাবে আপনার হাতের মুঠোয় ধরলে। যেন সে একমুঠো ফুল পেয়েছে, একটু চাপ পড়লে পাছে ভেঙে যায়।

তার চোখে জল এসে পড়েছে।

খবরটা সে ভেবেছিল কাউকে বলবে না।

কিন্তু মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে সে ডিকির কাছে কথাটা বলে ফেললে। কারখানার ছুটির পর, সন্ধ্যার সময় হোটেলের সামনা-সামনি চেয়ারে বসে দু পেয়ালা কফির পর সে কথাটা বললে।

ডিকিই বললে—কি ব্যাপার রে ডেভিড, আজ এতকাল পরে আবার নিজের থেকে ডেকে হোটেলে নিয়ে এলি? তার ওপর বেশ খুশি-খুশি ভাব! কি ব্যাপার বল্ দেখি?

সরস কৌতুকের ভঙ্গিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডেভিড আস্তে আস্তে বলল—আমি বিয়ে করছি রে ডিকি!

ডিকি গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল—সত্যি?

তার বিস্ময় প্রকাশটা এতই সোচ্চার হল যে তার গলার আওয়াজে চমকে উঠে আশেপাশের মানুষ একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

ডেভিড বললে—এই, করছিস কি? আস্তে।

ভ্রূক্ষেপহীনের মত ডিকি নিজের হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—Hearty Congratulations. ডেভিডও তার হাতখানা নিয়ে ঝাঁকি দিলে।

ডেভিড হেসে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ!

ডিকি হেসে বললে—তোকে কতবার বললাম, একবার আলাপ করিয়ে দে। তা তুই দিলি না কিছুতে!

ডেভিড বললে—কি করব বল। ওকে বলেছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হয় না! বলে—অমন করলে আর তোমার সঙ্গেও আমি দেখা করব না! তুই তো জানিস না কি রকম জেদী মেয়ে!

ডিকি কথা পালটে বললে—তা বিয়ে করছিস কবে?

—বিয়ে হতে এখন দেরি আছে। এখনও বছর খানেক।

গভীর বিস্ময়ে ডিকি ববলে—তার মানে? এত দেরি?

—হ্যাঁ দেরিই! সুসান তার আগে বিয়ে করতে রাজী নয়। ও পরীক্ষাটা পাশ করে নিতে চায়!

শুনে ডিকি বিচিত্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল একটিও কথা না বলে। তার সেই অস্বস্তিকর দৃষ্টির সামনে কেমন যেন লাগছিল ডেভিডের। ডিকির বিচিত্র দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে একটা স্পষ্ট অর্থ ফুটে উঠল। ফুটে উঠল অবিশ্বাস আর ব্যঙ্গ একসঙ্গে।

—কি হল? জিজ্ঞাসা করলে ডেভিড তার দৃষ্টির মধ্যে কোন অর্থ সংগুপ্ত হয়ে আছে জানতে।

ডিকি নিজের হাসিকে ব্যঙ্গে স্ফুটতর করে তুলে বললে—তুই একটা চিরকালের গবেট।

বিরক্ত হয়ে ডেভিড বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—এ কথা বলছিস কেন ?

—বলছি কেন ? কেন বলছি সে কথা বাদই দিলাম। তা বিয়েই যদি করবি এক দেড় বছর পরে কেন ? এখনি করে ফেল না ! বাধা কিসের ?

—টাকার। আমি যা মাইনে পাই তাতে দুজনের কষ্ট হবে। ও পাশ করে একটা চাকরি নিয়ে তারপর বিয়ে করবে।

—তা এখন নয়তো একটু কষ্ট করেই থাকবি দুজনে !

কথাটা মনে ধরল ডেভিডের। সে বললে—আমার তো আপত্তি নাই। কিন্তু সুসান রাজী হয় না।

—বলে দেখ না !

—তা বলতে পারি। তবে এক বছর পরে বিয়ে হলেই বা অসুবিধা কোথায় ?

ডিকি হাসল, বললে—তাই তো বলেছিলাম—তুই চিরকালের গবেট ! এক বছর অনেক সময়। আর তা ছাড়া তুই সুসানকে এখনি বিয়ের কথা বলে দেখ, আমার ধারণা সে রাজী হবে না।

ডেভিডের বুকটা ধড়াস করে উঠল, অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে সে বললে—কেন, এ কথা বলছিস কেন ?

—আমার ভুল হতে পারে। তবে আমার যতদূর অনুমান আমার ভুল হচ্ছে না। আমার ধারণা কি জানিস ?

—কি ?

—সুসান সময় নেবার খেলা খেলছে। ও ততদিন সময় নিয়ে যাবে যতদিন তোর চেয়ে ভাল লোক একজন না পায়।

চমকে উঠে প্রায় চীৎকার করে উঠল ডেভিড। তার চীৎকারে আশপাশের মানুষ আবার তাদের দিকে ফিরে চাইলে। সে বলে উঠল—তা হতে পারে না ! অসম্ভব।

তার এই ক্ষুব্ধ অবিশ্বাসের চীৎকারে কিছুমাত্র বিচলিত হল না ডিকি। সে শান্তভাবে বললে—অসম্ভব হলে আমিই সব চেয়ে সুখী হব। কারণ আমি তোর বন্ধু। তবে আমি যা বললাম আমার ধারণা তাই আসল সত্য।

—কি ধারণা তোর ? মর্মান্তিক দৈহিক আঘাতে মানুষ যেমন কাতর হয়ে চীৎকার করে তেমনি ভাবে প্রশ্ন করলে ডেভিড।

এক নিষ্ঠুর কৌতুকবোধে আরও শান্ত হয়ে আসে ডিকির কণ্ঠস্বর। তীর দিয়ে মেরে আহত পশুপাখীর ছটফটানি দেখতে এক ধরনের ভাল-লাগা আছে। সেই ভাল-লাগা চোখে নিয়ে চোখ দুটো ছোট করে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে রইল ডিকি। সুসানকে ডিকি দেখেছে। দেখেই সে বুঝেছে এ কন্যা তাদের জীবনের ক্ষেত্রে নেমে আসে না কোন দিন। যদি কখনও নিজের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে ভুল করে তাদের জীবন-বৃত্তের পরিধির মধ্যে এসেই পড়ে তবে সে ভুল ভাঙতে তার এতটুকু দেরি হবে না, তার পর মুহূর্তেই সে নিজের জীবনবৃত্তে ফিরে যাবে। ডিকির মনে তীব্র ঈর্ষ্যার জ্বালার সঙ্গে এই সান্ত্বনার তৃপ্তিও ছিল। কিন্তু আজ যখন সে দেখলে সে যা ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা পেয়েছিল সবটাই মিথ্যা হয়ে গিয়েছে তখন ঈর্ষ্যার জ্বালাটা দ্বিগুণিত হয়ে উঠল। তাই ডেভিডের সুখের ভিত্তিমূলে আঘাত করে বসল সে। হয় তো জেনে বুঝেই করলে। সজ্ঞানে করেনি। তার সংগুপ্ত তীব্র ঈর্ষ্যাই তাকে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিয়েছে। সে ভেবেছিল ডেভিড তীব্র প্রতিবাদ করবে। তার এই আঘাত সুসানের প্রেম সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসে গায়ে লেগে বীর্যহীন হবে পড়বে। কিন্তু পরম তৃপ্তিতে সে প্রত্যক্ষ করলে তার বিশ্বাসের মর্মমূলে কোথায় গভীর দুর্বলতা বেধে আছে। তার তীর একেবারে তার মূল বিন্দুতে গিয়ে আঘাত করেছে। সেই আঘাতে ছটফট করছে ডেভিড। তার মনোভাব বুঝবার বিন্দুমাত্র শক্তি বা সামর্থ্য নাই ডেভিডের। নিজের আঘাতের যন্ত্রণায় সে বিকল।

ডিকি শান্ত কোমল কণ্ঠে, তার যন্ত্রণাকে মনে মনে উপভোগ করতে করতে বললে—বলি শোন্। যা বলব তা তোকে অনেক দিন আগে প্রথম দিনই বলেছিলাম। তুই যে মেয়েকে পেয়েছিস ও মেয়ে আমাদের শ্রেণীর মেয়ে নয়। ওরা জেণ্টলম্যানের মেয়ে, ওরা লেডী। ওরা ইস্কুল-কলেজে পড়ে, গান শেখে, গুণবতী হয়। তারপর একদিন নিজেদের সমাজের মধ্যে পছন্দমত মানুষ বেছে নেয়। সে লোক নিশ্চয়ই তোর মত লেখা-পড়া না-জানা মেকানিক নয়। সে হবে বিলেতের ডিগ্রীওয়ালা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার; নয়তো ডাক্তার, নয় প্রফেসার, নয় ব্যবসাদার। তার গাড়ি থাকবে, ভাল ফ্ল্যাট থাকবে, ব্যাঙ্কে অনেক পয়সা থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, তার নিজের মত সমাজ থাকবে।

তুই বল তো ডেভিড, তোদের বিয়ের পর তুই না পারবি তোর স্ত্রীর সমাজে মিশতে, তোর স্ত্রীও পারবে না তোর বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে।

ডেভিডের মুখটা সাদা হয়ে গেল। কফির কাপে পানীয়টা ঠাণ্ডা হয়ে তার উপর একটা চিলতে পড়ে গেল। সে ছুঁতেও পারলে না। তার খেয়ালও হল না কখন ডিকি চলে গিয়েছে, আর হোটেলের আলোকোজ্জ্বল শোভার সামনে সে শূন্যমনে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর যেদিন আবার সুসানের সঙ্গে দেখা হল তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সুসান—কি হয়েছে তোমার?

সে বিমর্ষমুখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল সুসান—কি, হল কি ডেভিড, বল, আমাকে বল।

তখন ধীরে ধীরে সব কথা তাকে আস্তে আস্তে বলে ফেললে ডেভিড।

বলে সুসানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সুসানের সাদা মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে গিয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে—কেন তোমার বন্ধুকে আমার কথা বলেছ?

ভয়ার্ত শিশুর মত তার মুখের দিকে অপরাধীর মত তাকিয়ে রইল ডেভিড।

সুসান বললে—আর কোন দিন আমার সম্পর্কে কোন কথা কোন বন্ধুকে জানাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে ঘাড় নেড়ে ডেভিড জানালে—আচ্ছা!

এক মুহূর্তে সুসানের মুখের চেহারা বদলে গেল। সে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে সে বললে—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ ডেভিড। তুমি ছেলেমানুষ বলেই তোমার মন ছোট ছেলের মত নরম। সবারই কথা বিশ্বাস করে বস। জীবনে কাকে বিশ্বাস করবে, কাকে বিশ্বাস করবে না এটা তো আর কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না। তবু তোমাকে আমি সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে বলে রাখি—তুমি আমার ব্যাপারে আমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বুঝলে?

তারপর তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অন্যহাত দিয়ে সস্নেহে আঘাত করতে করতে বললে—তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ আছ! তুমি একটি মেয়েকে বিয়ে করবে। তার যোগ্য শক্ত পুরুষ হও।

কিন্তু কি রকম একটা গোলমাল ঘটে গেল তার মনের ভিতর।

শুভ্র আলোকোজ্জ্বল একটা অনুভবের গায়ে একটি কলঙ্করেখার দাগ ধরে গেল যেন কেমন করে। একটি বিচিত্র যন্ত্রণাময় সন্দেহের কলঙ্করেখা। সুসান যা বলেছে সব ঠিক, কিন্তু—।

ঐ এক কিন্তুকে সে কিছুতেই নিজের মনের ভিতর থেকে দূর করতে পারল না। আর ঐ কিন্তুই তাকে আবার কেমন করে যেন টেনে নিয়ে গেল ডিকির কাছে। কিছুদিন নিজের মনে মনে একটা গূঢ় যন্ত্রণা অনুভব করলে। সে যন্ত্রণার কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করলে না সুসানের কাছে। শেষে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ডিকির সম্পর্কে সুসান যা বলেছিল সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকী সবটা বলে ফেললে ডিকিকে। বলে তার কাছে পরামর্শ চাইলে।

ডিকি গম্ভীরভাবে বললে—তখনই বলেছিলাম। যদি তোকে বিয়ে করবার ইচ্ছাই থাকবে তবে তো তোকে ভাল করে বুঝিয়ে বললেই পারত! অত জোর করার কি দরকার ছিল? তোকে নরম আর বোকা মানুষ পেয়েছে। মেয়েটাকে তুই বুঝতে পারিস নি। কিন্তু মেয়েটা তোর স্বভাব ঠিক বুঝতে পেরেছে! তাই তোকে ধমক দিয়ে বোকা বুঝিয়ে দিয়েছে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে তার অন্তরাত্মা তারস্বরে প্রতিবাদ করতে চাইলে—না, না, এ ঠিক নয়! কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলে না। বলতে না পেরে একটা ক্লিষ্ট অপ্রস্তুত হাসির মুখোস পরে রইল নিজের মুখে। এবং সেই হাসি মুখেই সমস্ত বিষাক্ত কথাগুলো শুনে গেল।

ডিকি তার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ মানুষ। সে তাকে একটা সুন্দর পরামর্শ দিলে। বললে—এ ব্যাপার আর এ রকমভাবে চালানো ঠিক নয়! কারণ এভাবে চালালে শেষ পর্যন্ত মেয়েটির হাতে দুঃখ পাবি। তার চেয়ে এব একটা ফয়সালা করে ফেল। আর দেরি করিস না!

অসহায়ের মত বিহ্বলভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডেভিড বললে—তা হলে কি করব?

গম্ভীরভাবে বিজ্ঞ ডিকি বললে—তুই ওর বাবা মিঃ স্টকডেলের সঙ্গে একবার দেখা কর এবং তাঁর কাছে 'প্রপোজ' কর, বল—আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই!

ডেভিডের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেল। সে সুসানের কাছে শুনেছে মিঃ স্টকডেলের সামনে দাঁড়ান অত্যন্ত অসম্ভব কথা!

ডিকি তার ভয়টা ঠিক বুঝতে পেরেছে। সে জোর দিয়ে বললে—তোর ভয় কি? তুই চুরিও করতে যাচ্ছিস না, ডাকাতিও করতে যাচ্ছিস না! তোর ভয় কি? আর তোর যদি বেশী ভয় লাগে আমি তোর সঙ্গে যাব!

রাজী হতে হল ডেভিডকে!

তারপর অনেক পরামর্শ করে স্থির হল সুসান যখন বাড়িতে থাকবে না অথচ মিঃ স্টকডেল থাকবেন সেই সময় ডেভিড তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ডিকি থাকবে সঙ্গে।

কাজ হল সেই অনুসারে।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল মার্চ মাসের দিন। সকাল নটা।

ডেভিড জানে সুসান বেরিয়ে গিয়েছে ওর ইস্কুলে। মিঃ স্টকডেল ব্রেকফাস্ট করে অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে।

ডিকি তার কাঁধে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললে—যা, চলে যা! কোন ভয় নেই।

ডেভিড অবাক হয়ে গেল। কথা ছিল ডিকিও যাবে তার সঙ্গে। সে তাই অবাক হয়ে বললে—তুই যাবি না?

—আমার যাওয়াটা ভাল দেখায় না! তোর পার্সন্যাল ব্যাপার। তোর কোন ভয় নাই। আমি তো এই নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অগত্যা একাই যেতে হল ডেভিডকে। সত্যিই তো, এই সব গোপন কথার সময় তৃতীয় ব্যক্তির থাকার কথা নয়! সে অনেক সাহস করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। দাঁড়াল গিয়ে সুসানদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে। দাঁড়িয়ে পা কাঁপতে লাগল। দরজায় পেতলের নেম-প্লেটে লেখা—মিঃ স্যামুয়েল স্টকডেল। ইন্।

অনেক সাহস করে সে কলিং বেলে হাত দিলে। ভিতরে কলিং বেল সজোরে বেজে উঠল।

আর ফেরার উপায় নাই।

দরজা খুলে গেল পর মুহূর্তেই। প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক তার সামনে দাঁড়িয়ে। ফর্সা রঙ, নীল চোখে তীক্ষ্ণ

জিজ্ঞাসা। ভারী গম্ভীর অথচ প্রসন্ন গলায় ভদ্রলোক লম্বা করে এক কথায় প্রশ্ন করলেন—ইয়েস ?

—আমি ডেভিড রোজারিও। আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

মিঃ স্টকডেলের নীল চোখে জিজ্ঞাসা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল। তিনি তবু ভদ্রভাবে বললেন—প্লিজ কাম ইন্। দয়া করে ভিতরে আসুন।

ভিতরে ঢুকল ডেভিড। একবার চারিপাশে তাকিয়ে দেখে নিলে। পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সম্ভ্রান্ত, শান্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ নিজের জীবনে রচনার জন্য অদম্য তৃষ্ণা ডেভিডের। অথচ তার মনে হল এই জানলায় ক্যাকটাসের টব, টেবিল, সোফা, সেটি সব যেন তার দিকে তীব্র বিরোধিতার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

একটা, দুটো বিভ্রান্ত মুহূর্ত। তারপরই মিঃ স্টকডেলের গম্ভীর, শান্ত, ভারী কণ্ঠস্বর—P1ay sit down. বসুন।

আড়ষ্টের মত একটা সোফায় বসল ডেভিড।

মিঃ স্টকডেলও বসলেন তার সামনে। হাতের ঘড়িটা একবার দেখে শান্তভাবে বললেন—আমার হাতে বেশী সময় নেই সওয়া নটা বাজে। আপনার যা বক্তব্য আছে একটু তাড়াতাড়ি বলুন দয়া করে।

ডেভিড একবার গলা ঝেড়ে নিলে। কিন্তু কোন কথা বেরুল না গলা দিয়ে।

মিঃ স্টকডেল চেয়ারে একবার পার্শ্বপরিবর্তন করলেন চঞ্চল হয়ে। গলাটা একবার ঝেড়ে নিলেন। কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল নীল চোখের তীব্র দৃষ্টি তার মুখের উপর স্থিরনিবদ্ধ।

আবার একবার ঢোঁক গিলে ডেভিড তার একমাত্র বক্তব্য ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে ফেলল—আমি,—আমি আপনার মেয়ে সুসানকে বিয়ে করতে চাই।

মিঃ স্টকডেল পাথরের মূর্তির মত চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি টর্চের আলোর মত একবার দপ করে উঠল। চোখের আগুন পর মুহূর্তেই নিভল বটে, কিন্তু দু চোখের নীল তারা অগ্নিগর্ভ অঙ্গারের মত দীপ্তিমান হয়ে রইল। তিনি একটু নড়েচড়ে শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন—তা আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চান, এ কথা আমার মেয়েকে না বলে আমাকে বলছেন কেন ?

প্রথমেই আসল কথাটা বলতে পেরে সাহস এসে গিয়েছে ডেভিডের। প্রশ্নটা শুনে তার বুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠল। সে বললে—আপনার মেয়েকে বলবার আগে আপনার অনুমতি নেওয়া উচিত মনে করেই আপনার কাছে এসেছি।

মিঃ স্টকডেল যদিও ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন তবু মনে মনে যেন খুশীই হয়েছেন এমনিই মনে হল ডেভিডের। তিনি শুধু বললেন—I see.

তারপর তার দিকে তাকিয়ে বললেন—যখন আমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করছেন তখন অবশ্যই আমার মেয়েকে চেনেন আপনি! কতদিনের আলাপ আপনাদের দুজনের?

—সামান্যই! মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আর কোন রাস্তা না দেখে মিথ্যা কথাই বললে।

—আপনার নাম কি?

—ডেভিড রোজারিও!

—রোজারিও? প্রশ্ন করলেন স্টকডেল।

—ইয়েস স্যার।

ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু চুপ করে রইলেন মিঃ স্টকডেল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি করেন?

—আমি মোটর কারখানায় মেকানিকের কাজ করি।

—আপনি কি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার?

—না। আমি মেকানিক।

—আই সি! কত মাইনে পান? অত্যন্ত শীতল কণ্ঠস্বর।

—তিনশোর মত!

—ও, তিনশো নয়, তিনশোর চেয়ে কম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদূর লেখাপড়া করেছেন? আপনি গ্র্যাজুয়েট?

—আজ্ঞে না জুনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পর্যন্ত—

—জুনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাশ করেন নি তাহলে?

—আজ্ঞে না।

—আই সি! একটু স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে আবার তাকিয়ে থাকলেন মিঃ স্টকডেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সেই স্বল্পক্ষণ তাঁর তীব্র দৃষ্টি নিয়ে যেন তাকে

বিদ্ধ করলেন মিঃ স্টকডেল। তারপর অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোমার স্প্লিন্টারের মত তাঁর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে এল—লোফার, স্কাউন্ড্রেল, ব্ল্যাক ডগ!

তিনি একটা হাত দরজার দিকে প্রসারিত করে দিলেন।

ডেভিডও চমকে উঠল। সেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

গালাগাল শুনে সে বিস্মিত হয়ে বললে—আপনি অকারণে গালাগাল করছেন কেন?

অকস্মাৎ এক পা সরে গিয়ে হ্যাটস্ট্যাণ্ড থেকে মালাক্কা বেতের ভারী ছড়িটা বিদ্যুৎগতিতে তুলে নিয়ে তিনি আস্ফালন করে বললেন—গেট আউট। আর যদি কোন দিন আমার দরজা মাড়াবার চেষ্টা কর তা হলে এমনি করে যেমনভাবে কুকুর মারে তোমাকে মারব।

তাঁর হাতের ছড়িটা সজোরে ডেভিডের উপর নেমে আসছে ততক্ষণে।

বুঝতে পেরেই ডেভিড দরজার কাছে দাঁড়াল।

মিঃ স্টকডেল আবার তাড়া করে এলেন। তখন আর সিঁড়ি দিয়ে কুকুরের মত পালিয়ে আসা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ডেভিডের।

রাস্তায় নেমে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে থমকে দাঁড়াল সে। তাকে দেখে ডিকি ছুটে এল—কি হল রে?

হাঁপাতে হাঁপাতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে—কিছু না, চল। তুই যা বলেছিস তাই ঠিক।

—কিছু না! চল!

সে আর ডিকির জন্য অপেক্ষা না করে হাঁটতে লাগল দ্রুত পদক্ষেপে।

সেই দিন থেকে যে কি হল! সুসান যেন তার জীবন থেকে অন্তর্ধান করে গেল। যেদিন সুসানের আসার কথা ছিল সে দিন এল না সে। তারপর থেকে বহুদিন আর তার সাক্ষাৎ নাই।

সে মনে মনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কি হল, কেন হল, সে আর কিছুতেই কিছু হিসেবের মধ্যে আনতে পারলে না।

একবার মনে হল ডিকির পরামর্শ শুনেই সব গোলমালটা ঘটল যেন। আবার ডিকির কথাই সত্য মনে হল শেষ পর্যন্ত।

ডিকিই বললে একদিন সে কথা—কেমন, আমি বলিনি তোকে? এখন তো বুঝলি?

ডেভিডের আর কিছু বুঝবার অবস্থা ছিল না।

সুসান তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে। বলে কয়ে নয়, কিন্তু সুসান তার কাছে আসা দূরে থাকুক, সুসানের আর সাক্ষাৎ পর্যন্ত মেলে না। ডেভিড একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিন সুসানের বাড়ির কাছেপিঠে দাঁড়িয়ে থাকল আড়ালে আবডালে। মনে ভয় ছিল পাছে মিঃ স্টকডেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। একদিন দেখা হতে হতে বেঁচে গিয়েছে। দেখা হলে যে কি হত তা ভগবানই জানেন। হয়তো শয়তানটা হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে তাড়া করে আসত লাঠির অভাবে।

এত করেও সুসানের দেখা মিলল না। সুসান বোধ হয় আজকাল বাড়ি থেকে একদম বের হয় না!

হতাশ হয়ে প্রতি শনিবার সে আবার দাঁড়াতে আরম্ভ করলে সেই পার্কের ধারে।

প্রথম শনিবার দেখা মিলল না।

দ্বিতীয় শনিবার দেখা মিলল। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তার বুকের ভিতর থেকে কি যেন গলা দিয়ে ঠেলে উঠে জলে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। সে চোখের জল মুছে সহজ হতে না হতে সুসান এসে পড়ল তার সামনে।

সুসান একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে। কিন্তু সে যেন তাকে দেখেও দেখলে না। তাকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

সে সপ্তাহ যে কি করে কাটল ডেভিডের! বড় দুঃখের, বড় মর্ম-যাতনার সপ্তাহ।

তার পরের শনিবার সে সুসানের নিস্পৃহতাকে অগ্রাহ্য করে একেবারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে জলভরা দুই চোখ তার মুখের উপর রেখে ডাকলে—সুসান!

আস্তে আস্তে অথচ বেশ জোরের সঙ্গে তার হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে মুক্ত করে সে শান্ত, কঠিন গলায় জবাব দিলে—ইয়েস?

আবার তার হাতখান ধরবার জন্যে শূন্যে হাত বাড়িয়ে সে আবেগ-বিহ্বল হয়ে বললে—তুমি আমার ওপর কেন রাগ করে আছ সুসান?

তেমনি শান্ত কণ্ঠস্বরে ডেভিড আবার জবাব পেলে—তোমার উপর

রাগ করার আমার কোন কারণ নেই। রাগ করার যদি কিছু থাকে তো আমার নিজের ওপর আছে। তবে রাগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমি কেবল বুঝেছি আমারই ভুল হয়েছিল।

প্রায় ভেঙে পড়ে ডেভিড অসহায়ের মত বললে—কি ভুল হয়েছিল তোমার?

একটু হাসল সুসান। কঠিন তিরস্কারের চেয়েও কঠিন সে হাসি। সে বললে—আমার ভুল হয়েছিল তোমাকে বুঝতে! চরিত্রের যে দৃঢ়তা তোমার ভদ্রতার সঙ্গে আছে বলে ভেবেছিলাম তা তোমার নাই। তুমি অত্যন্ত দুর্বল সন্দিগ্ধ চরিত্রের মানুষ! থাক, ওসব কথা আলোচনা করে এখন কোন লাভ নাই।

কোন রাগের কথা হলে হয়তো গভীরতর আবেগ প্রকাশ করে কোন কথা বলতে পারত ডেভিড। কিন্তু এই আবেগহীন, কঠিন বাক্যগুলির সামনে তার সমস্ত আবেগ শুকিয়ে গেল, কথা হারিয়ে গেল। সে মার-খাওয়া মানুষের মত সুসানের মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ফ্যালফ্যাল করে।

সুসান ভ্রূকুটি করে বললে—এনিথিং মোর টু সে?

কোন জবাব দিতে পারল না ডেভিড।

সুসান জবাব না পেয়ে বললে—আমাদের আর দেখা করা সম্ভব হবে না। তুমি আর কোন দিন আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা ক'রো না!

দুজনে চলছিল পাশাপাশি। ডেভিড থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সুসান দাঁড়াল না তার জন্যে। সে ধীর মন্থর পদক্ষেপে অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে এগিয়ে বাঁকের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুঃসহ বেদনায় দুই চোখে জল নিয়ে অসহায় অপমানিতের মত ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড।

সে দুর্বল চরিত্র? সে সন্দিগ্ধ চরিত্রের মানুষ?

ভাবতেও তার দুই চোখ জলে ভরে আসে। এমন কথা কি করে বলে গেল সুসান? বলতে তার এতটুকু বাধল না?

স্বর্গচ্যুত দেবশিশুর মত নিজের হৃদয়-বেদনা নিজের মধ্যে ধারণ করে ঘুরে বেড়াল কয়েকদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত। মনের যে বাসনা এতদিন

বহির্লোকে এক আশ্চর্য প্রেমের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা পথ হারিয়ে হৃদয়ের মধ্যে জটাজালবদ্ধ জলধারার মতই পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। আর তার আত্মপ্রকাশের পথ নেই।

তারপর একদিন সেই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের বেদনা ধারণ করে রাখতে না পেরে ডিকির কাছে সব বলে ফেললে। ডিকি তার বন্ধু, তার পরামর্শদাতা, তার দুঃখের দিনের রক্ষাকর্তা।

ডিকি বললে—তোকে তো তখনই বলেছিলাম। আচ্ছা আমি ভাবি, আমাকে একটু ভাবতে দে! বুঝতে পারছি তুই ওকে ছেড়ে বাঁচবি না। আচ্ছা আমি ভাবি!

তারপর এক সপ্তাহ ধরে ভাবনা, ভাবনা, পরামর্শ আর পরামর্শ। গূঢ় গোপন পরামর্শ।

তারপর আবার এক শনিবার সেই পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডেভিড। সুসানকে সামনে পেতেই সে তার সামনে এসে গভীর কাতরতার সঙ্গে বললে—তোমাকে ছেড়ে আমি যে আর বাঁচি না 'সু'। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমার কিছু বলার আছে যে তোমাকে। বললে সব বুঝতে পারবে! তুমি আমার সঙ্গে যদি ইস্টারের দিন দেখা কর একবার। আমি একখানা গাড়ি পেয়েছি। গাড়িতে একটু ঘুরে তারপর আমার ঘরে একটু বসে, এক কাপ চা খেয়ে, আমার কথা শুনে বাড়ি ফিরবে।

অনেক সাধ্য-সাধনা, অনেক অনুরোধ-উপরোধ। তারপর রাজী হল সুসান!

কিন্তু সুসান আজ বিস্মিত হয়ে দেখলে—ডেভিডের চোখে জলের চিহ্ন মাত্র নাই!

সুসান এল।

সেই হাতির দাঁতের মত রঙের মুখ, সাদা পোশাক। কেবল যে মুখ আগে সব সময় সরস থাকত হাসিতে, একটা দুটো কথার খোঁচায় পাকা ফল থেকে মধুর রস গড়িয়ে পড়ার মত হাসিতে উথলে উঠত—সে সুসান আর নেই। এক দিকে শরীরটি যৌবনের পূর্ণতা লাভ করেছে, অন্যদিকে মুখখানি আগের দিনের মত কঠিন না হলেও গম্ভীর।

প্রথম বর্ষার শ্যাম-ছায়াঘন দিন।

চৌরঙ্গীর কোন একটা জায়গায় গাড়ি নিয়ে, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা ডেভিড দাঁড়িয়েছিল।

সুসান আসতেই সে একটু হেসে গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে ধরলে। প্রত্যাশা, সে গাড়ি ড্রাইভ করবে আর সুসান বসবে তার পাশেই।

ডেভিড হাসিমুখে বললে—এ প্লেজেণ্ট ডে, ইস্‌ন্‌টিট? বড় মধুর দিন নয়?

—ইয়েস, ভেরি ফাইন ওয়েদার। সত্যিই আজ আবহাওয়া চমৎকার। বললে সুসান, অত্যন্ত ভদ্রভাবেই। তারপর বললে—আমি কিন্তু পিছনে বসব।

সহজ হাসি হেসে ডেভিড বললে—কেন? আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাও না, না আমার ওপর এখনও রাগ করে আছ? আচ্ছা, আগে আমার আজকের কথাগুলো শোন। তারপর যা হয় করবে।

বলে সুসানের পিঠে হাত দিয়ে খানিকটা যেন জোর করেই সে সুসানকে সামনের সিটে বসিয়ে দিলে। নিজে উঠে গেল ড্রাইভারের আসনে।

তার পাশে বসতে বসতে সুসান নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—আমার কিন্তু হাতে বেশী সময় নেই। যা বলবার বলে ফেল।

—এত তাড়া কেন সুসান? আর আমার যা বলার আছে তা কি এই চলন্ত গাড়িতে বলা যায়? গাড়ি চালাবার দিকে মন দেব না তোমাকে মনোযোগ দেব!

—তোমার মনোযোগের জন্যে আমার খুব মাথাব্যথা নেই ডেভিড।

ডেভিড গাড়ি চালাতে চালাতে একবার তার দিকে চেয়ে হেসে উঠল। এ সেই প্রণয়-ভীরু সদাই হারাই-হারাই মনোভাবের মানুষ ডেভিডের স্বভাবসিদ্ধ হাসি নয়। এ এক বেপরোয়া মানুষের হাসি যেন। যেন এক দুঃসাহসী প্রগল্‌ভতা কোন্ আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে।

ডেভিড লক্ষ্য করলে সুসানের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

পথের উপর দৃষ্টি স্থিরভাবে রেখে গাড়ি চালাচ্ছে ডেভিড। ফাঁকা রাস্তা রেড রোড। দেখতে দেখতে ডেভিডের গাড়ির গতি বেড়ে গিয়ে স্পিডোমিটারের কাঁটাটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। পুরনো গাড়ি চলতে চলতে চলার বেগে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

সুসান অকস্মাৎ ভয় পেয়ে ডেভিডের স্টিয়ারিংয়ের হাতখানার একখানা হাত রাখলে। শঙ্কিত হয়ে বললে—কি করছ ডেভিড? আস্তে চল। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে যে!

সুসান বুঝতে পেরেছে, আজকের ডেভিডের মধ্য থেকে এক নূতন দুঃসাহসী ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারছে যাকে সুসান চেনে না, দেখেনি কোন দিন।

ডেভিড রহস্য করে হেসে বললে—ভয় পাচ্ছ? আমাকে ভয় লাগছে তোমার?

সুসান শঙ্কার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস ছেড়ে স্বস্তির সঙ্গে বললে—না, ভয় কিসের?

তার কথা শুনে হাসল ডেভিড।

সুসান বললে—আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে!

ডেভিড কোন উত্তরই দিলে না। তার গাড়ি এ রাস্তা, ও রাস্তা, ভিড়, নির্জনতার মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়াল তার বাসার সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে এসে এ পাশের দরজা খুলে সস্মিতভাবে সুসানকে বললে—এস, নেমে এস।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে স্বস্তির সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলে সুসান বললে—আমার এমনিই দেরি হয়ে গিয়েছে, বেশী দেরি করতে পারব না আর।

ডেভিডের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। নিজের হাত প্রসারিত করে বললে—কিছু দেরি হবে না! এক কাপ চা খেয়েই চলে যাবে। আর তা ছাড়া আমার আসল কথাই তো বলা হয়নি তোমাকে! এস।

তার প্রসারিত হাতের নিশানা ধরে সুসান তার ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের এক পাশে ছোট্ট সিঙ্গল বেডের খাট, অন্যদিকে ছোট রাইটিং টেবিলের পাশে চেয়ার। সেই চেয়ারে সে বসল। মুখে তার তাড়া যতই থাক, বসল বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে। টেবিলের উপর গিল্টি-করা ফ্রেমে সুসানের হাসি-হাসি মুখের ছবি সুসানের দিকেই চেয়ে আছে। ছবির মাথায় দুটো লিলিফুল গোজা। তার ছবির সমাদর থেকে তার সমাদরের অস্পষ্ট অনুভব তার মনে আসতেই তার মুখখানা লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল। তবে ডেভিড ভাগ্যে দেখতে পায়নি!

কিন্তু চায়ের জল গরম করবার জন্যে ব্যস্ত থাকলেও সুসানের

লজ্জারক্ত মুখখানি ঠিকই লক্ষ্য করছিল ডেভিড। চায়ের জল চাপিয়ে সে এসে দাঁড়াল সুসানের পাশে।

সুসান তার মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর নিশ্চিন্ততা ও বিশ্বাসের মধ্য থেকে যে ধরনের কপট তিরস্কার করা যায় তেমনিভাবে ধমক দিয়ে বললে —কি বলবে বল? বলি বলি করেই সব সময়টা কাটিয়ে দিলে।

—এই যে বলি! চাপা গলায় বললে ডেভিড তার মুখের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে।

তার পরমুহূর্তেই সে দরজার কাছে সরে গিয়ে আকস্মিকভাবে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুসানের দিকে।

সুসান ততক্ষণে বিদ্যুৎ-আহতার মত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে। সে স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখখানা অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর।

ডেভিড দরজার কাছ থেকে সরে আসতে লাগল তার দিকে এক পা এক পা করে। তারপর সুসানের একান্ত কাছে এসে তার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে বাঘের থাবার মত।

সুসান ততক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে।

তারপর দীর্ঘক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ডেভিডের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করলে। চোখের পাতার চাপে দুটি সুদীর্ঘ জলের ধারা কানের পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

তারপর এক সময় তাকে ডেভিড ছেড়ে দিতেই সে আস্তে আস্তে অপমান-শয্যা থেকে উঠে দাঁড়াল।

ডেভিড দরজা খুলে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল ডিকি। মুখে তার অস্পষ্ট বিচিত্র হাসি!

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল সুসান। আর্তস্বরে চীৎকার।

সুসান কি পাগল হয়ে গেল নাকি? ভয়ার্ত ভাবে ডেভিড ডাকলে— সুসান! সুসান! সু!

সুসান তার মুখের দিকে তাকালে না, তার কথাও বোধহয় শুনলে না। আরক্ত, উত্তেজিত দৃষ্টিতে বিস্রস্ত চুলে পোশাকে সে যেন এক পাগলের চেহারা তার! সে আপনার মুখ ব্যাদান করে, নিজের সমস্ত

শক্তি প্রয়োগ করে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল হিস্টিরিয়া রোগ-গ্রস্তের মত।

মুহূর্তমধ্যে দরজার কাছে লোকের ভিড় জমে গেল।

জনতার দিকে তাকিয়ে, নিজের একখানা হাত প্রসারিত করে তার আঙুল ডেভিডের দিকে তীরের ফলার মত উদ্যত করে সুসান চীৎকার করে উঠল—অ্যারেস্ট ছাট ম্যান, ছাট ডেভিল। ওকে ধর! শয়তান! শয়তান!

তারপর আইন-আদালত, সাক্ষী-জেরা, বিচার।

বিচারে একমাত্র সে-ই অভিযুক্ত হল। সাত বৎসর জেল।

সুসান তাকে ক্ষমা করেনি।

॥ ছয় ॥

জেলের মধ্যে কতদিন ধরে যে ডেভিডের গল্প শুনলাম!

একটু একটু করে, এখান ওখান থেকে, তার মেজাজ ও মর্জি মাফিক। নানান কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

এ গল্প শুনতে আমার অন্তত বছরখানেক লেগেছিল।

যেদিন নিজের দুষ্কৃতির শেষ কথাটি সে নিজের অবাধ্য মনকে বার বার শাসন করে কোনক্রমে বলতে পেরেছিল সেদিন, ভাল করে লক্ষ্য করেছিলাম, বলা শেষ করে স্থাণুর মত বসেছিল ডেভিড মাথা হেঁট করে। আমিও তার দুষ্কৃতির অপরাধের ভারে বসেছিলাম মাথা হেঁট করে। যখন মাথা তুললাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তখনও দেখলাম সে মাথা হেঁট করে বসে আছে, তার সামনে বাঁধানো মেঝের খানিকটা তার চোখের জল পড়ে ভিজে উঠেছে।

ডেভিড অপরাধের গ্লানিতে কাঁদছে। ভালই করছে।

আমি, প্রায় এক বছর আগে, যেদিন ওকে প্রথম দেখেছিলাম সেদিন যে হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ মানুষকে দেখেছিলাম সে হারিয়ে গিয়েছে। আজ এক বছরের সাহচর্যে বুঝতে পারি স্পষ্ট করে ডেভিড সেদিন নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে মনে না করে থাকতে চেয়েছিল; অথবা অপরাধবোধটা ঝেড়ে ফেলবার জন্যই এক জোর-করা হাসিখুশির চেষ্টা করত।

কিন্তু একটা চলতি দেশী কথা যে এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ত বার বার। 'কাদা মাখলে কি যমে ছাড়ে'? ছাড়ে না। নিজের অপরাধের হাত থেকে সে যাবে কোথায়? সেই অপরাধের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে আরম্ভ করেছে সে।

আমি জানি অন্তত ডেভিডের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি নাই। কারণ সে ক্রিমিন্যাল নয়, তার মনে অন্যায় করে করে ঘাঁটা পড়ে গিয়ে মন তার অসাড় হয়ে যায়নি। তার ঐ পাতলা ছিপছিপে দেহকাণ্ডের অন্তরালে যে মনটি ক্রিয়াশীল সে অত্যন্ত সুকুমার। তাই তার যন্ত্রণার পরিমাণ একটু বেশীই হবে।

এ যন্ত্রণা ও ভোগ করুক। ওই যন্ত্রণার আগুনই ওকে পরিশুদ্ধ করবে।

তবু বললাম—ডেভিড, আর কেঁদ না, চুপ কর।

বলেই মনে মনে ভাবলাম—যে চোখের জল একদিন ও পাত করিয়েছে, নিজের চোখের জল ছাড়া তার মূল্য শোধ হবে কি করে?

আমি আবার বলায় ডেভিড উঠে দাঁড়াল চোখের জল মুছতে মুছতে। যাবার জন্যে সে পা বাড়িয়েছে, আমি আবার কি মনে করে তাকে ডাকলাম—ডেভিড!

আমার কণ্ঠস্বরে নিশ্চয় এমন কোন কোমল মমতার স্পর্শ আমার অগোচরেই ছিল যা শুনে ডেভিডের চোখ ফেটে আবার জল এল; দুই ঠোঁটে আবার কান্না ফুঁপিয়ে উঠল। সেই ফুঁপিয়ে-ওঠা কান্না ভেদ করে এক ঝলক মর্মান্তিক আক্ষেপ ঠেলে বেরিয়ে এল যেন। সে মর্মান্তিক হাহাকারের মত বললে -স্যার, সংসারে আমার আর এমন কেউ নাই যার মুখ মনে করে বেঁচে থাকব কিংবা যে আমার জন্যে, আমার মুখ মনে করে বেঁচে আছে ভেবে সান্ত্বনা পাব। জেল থেকে যেদিন বেরিয়ে যাব সেদিন দাঁড়াব কাব কাছে গিযে”

হাহাকারের কথা বইকি! কিন্তু কেবল মাত্র সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বললাম—এত দুঃখ করছ কেন ডেভিড? তোমার মা তো রয়েছেন!

তার খেদোক্তি শুনেহ কথাটা মনে পড়েছিল বলেই তাকে তার মায়ের কথাটা বলতে পারলাম।

কথাটা ডেভিডই আমাকে বলেছিল একদিন প্রসঙ্গক্রমে নিজের জীবনের কথা বলতে বলতে।

একদিন সুসানের সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে সে চলেহিল চৌরঙ্গী ধরে। সুসানের অত্যন্ত সন্নিকটে বসে, তার মাথার চুলের সুঘ্রাণ নিতে নিতে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে সে হুকুম করেছিল কোন্ রাস্তা দিয়ে এখন আনন্দ-যাত্রায় যেতে হবে। হঠাৎ নজর পড়েছিল রাস্তার দিকে। মনের গহন কন্দরে কোন চেনা ছবি বাইরের রাস্তায় যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে! সেই চেনা, অপরিচিতের প্রত্যাশায় রাস্তার দিকে তাকাতেই নজর পড়ল মা দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের উপর একটি বছর চারেকের ছেলের হাত ধরে।

মায়ের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি ঘর ছাড়ার পর। দেখা হয়নি

ঠিক নয়, সে-ই দেখা করেনি। কেন দেখা করবে? সেই শয়তান ঘড়িয়াল কুমীরটা যেখানে গৃহকর্তা সেখানে সে যাবে কেন? তবে মায়ের সব সংবাদই সে রাখে। মায়ের একটি ছেলে হয়েছে এ সংবাদ সে চার বছর আগে যথাসময়েই পেয়েছিল। মায়ের সঙ্গের ছেলেটিকে দেখে বুঝলে এ সেই ছেলে!

ছেলেটার দিকে নজর পড়তেই তার মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ সেই লোকটার ছেলে, এই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এই ছেলেটা এসে তাকে মায়ের মন থেকে মুছে দিয়ে নিজে মায়ের স্নেহ কেড়ে নিয়েছে, সব স্মৃতি জুড়ে বসেছে। তবু যদি ছেলেটার চেহারা ভাল হত! ঐ শয়তান কুমীরের ছেলের চেহারা আর কত ভাল হবে! রোগা-পটকা চেহারা; মাথায় অস্বাস্থ্যকর খসখসে চুল; হ্যাংলা মুখখানা, বড় বড় খালের মধ্যে চোখ দুটো ঢুকে আছে। মায়ের সঙ্গে কি কথা বলতে গিয়ে ওর দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল, সামনের কটা দাঁতও পোকা-খাওয়া।

কিন্তু পর মুহূর্তে নজর পড়ল মায়ের মুখখানার দিকে।

তার সেই মা কি হয়ে গিয়েছে! সেই গোলালো, নরম নরম, নিটোল পাকা ফলের মত সরল মুখখানির সমস্ত লাবণ্য চলে গিয়েছে, মুখে হাসি নাই। সেই গোল মুখখানি লম্বা হয়ে গিয়েছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে। মা বাচ্চাটির হাত ধরে বিপন্ন মুখে, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় রাস্তা পার হবে।

মায়ের চেহারা দেখে তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ইচ্ছা হল গাড়ি থামিয়ে নেমে মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঐ শয়তানের বাচ্চাকে দেখে শয়তানকে স্মরণ করে সে নিজেকে সম্বরণ করেছিল।

সুসান জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোমার? অমন করে কি দেখছ রাস্তায়?

ডেভিড সেদিন নিঃসঙ্কোচে জবাব দিতে পেরেছিল—নাথিং, জাস্ট অ্যান অ্যাকয়েনটেন্স। চেনা মানুষ।

জীবনের আত্মমগ্ন সুখ-বিবশতায় সেদিন মাকে কেবলমাত্র চেনা-মানুষ বলে চালিয়ে দিতে তার বিন্দুমাত্র বাধে নি।

সেদিন অবশ্য সে জানত না যে তার সৎ-বাবা মিঃ এণ্ড্রু গোমেজ সেই

সময়ে নিদারুণ ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, মায়ের মানসিক ও সাংসারিক অবস্থা বিপর্যস্ত। এবং এরই কিছু দিন পর মিঃ গোমেজ মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাতে ডেভিডের কি? তার জীবনে মা হারিয়ে গিয়েছে তার জন্যে ওর কোন দুঃখও নেই, তাই যখন বললাম তাকে, দুঃখ করছ কেন, তোমার মা তো আছেন, তখন বলেই বুঝলাম—কথাটা বলে ভুল করেছি। কারণ ডেভিড যখন বললে—সংসারে তার কেউ নাই তখন সে বিশ্ব-সংসারের মধ্যে শুধু একজনের কথাই মনে করেছে, আর কারও কথা তার মনে হয় নি।

তাই আমি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড আব কিছু বলল না। মাথা হেঁট করে ধীর পদে সেখান থেকে চলে গেল।

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাসি এল না। হাসতে পারলে হয়তো আমাব পক্ষে ভালই হত।

এ কি বিচিত্র লীলা! মানুষের জীবনে এ মিথুন-লীলা কি বিচিত্র।

কালে কালে মহাকবিরা এরই লীলাগান করে নিজেবা ধন্য হযেছেন, মনুষ্য সমাজকে সেই অবিনশ্বর সঙ্গীত চিরপূর্ণ অমৃতভাণ্ডের মত দান করে গিয়েছেন। কিন্তু সে গানে আলো আর আনন্দের কথাব ভাগই যেন বেশী। বিরহ-বেদনার অংশ থাকলেও তা আনন্দোজ্জ্বল পৃথিবীতে মৃদু ছায়ার মত। কিন্তু এর সঙ্গে যে কত বিষ, কত ক্ষোভ, কত হিংসা, কত হাহাকার মানুষের হৃদয়ে মৃত্তিকাগর্ভের অন্ধকারালোকে ফুটন্ত লাভা-স্রোতের মত ফুটে উঠে মানুষকে পীড়িত করে, আশপাশের মানুষকে তার তাপ ও বিষ সহ্য করতে হয তার হিসাব, তার ছাপ কি কেউ রেখেছেন? এর উঁত্তরও আমার অজানা নয। আমি জানি আলোকের, আনন্দের পাত্রটুকুই তাঁরা মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। বাকিটুকু, যা অন্ধকার, যা বিষ তা মানুষের থেকে দূরে সরিযে ফেলেছেন।

আমি তো আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ডেভিডের যন্ত্রণা।

একটা মারাত্মক ভুল করে, হঠকারিতা করে ফেলে সে তার প্রেমের অমৃতকে একপক্ষে ঘৃণা, অন্যপক্ষে ক্ষোভ, মর্মযাতনা আর হাকারের বিষে রূপান্তরিত করেছে। তারই জ্বালায় সে অস্থির। তারই সঙ্গে আছে আবার বিচিত্র এক কৌতুক। যত ক্ষোভ, যত মর্মযাতনা আর হাহাকার

তাকে পীড়িত করছে মন ততই আবার নূতন করে ফিরে চাইছে সেই একতমাকে। সেখানে লজ্জা নাই, বিবেচনা নাই, সঙ্কোচ নাই। লজ্জাহীন অবিবেচকের মত অকুণ্ঠ অলজ্জতায় ক্রন্দনপরায়ণ শিশু হয়ে তারস্বরে সেই অপ্রাপ্যকে পাবার জন্য হাহাকার করছে।

চোখের সামনে দেখছি যন্ত্রণায় ছেলেটা পালটে যাচ্ছে।

একবার অগ্নিদাহ আরম্ভ হলে মনোলোকে, কয়লার খনিতে ফায়ারের মত সে সহজে নেভে না। সে নিজের বেগে বাড়ে। ছেলেটারও তাই ঘটছে। তার সঙ্গে কথা বলে তার যন্ত্রণাটা যে চেহারা নিয়েছে সেটা কিছু খানিকটা বুঝতে পেরেছি।

ও যে সুসানের ওপর মারাত্মক একটা অন্যায় করেছে এ অপরাধবোধের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সুসানের মমতা ভালবাসা ফিরে পাবার জন্যও অসীম আগ্রহে পীড়িত। অপরাধবোধের যন্ত্রণার চেয়ে সেটা আরও তীব্র। সে মনে মনে বুঝতে পারছে সংসারে সে সব পেতে পারবে; অতি দুর্লভতম, মহার্ঘতম কোন কিছুও পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এ জীবনে সে আর যা কিছুতেই পাবে না তা হল সুসানের ভালবাসা।

অথচ সেই অসম্ভবের জন্যই ওর অন্তর হাহাকার করছে।

ও জানে, অন্তরে নিশ্চয় জানে, সুসানের সমস্ত ভালবাসা ও বিষ মিশিয়ে তাকে ঘৃণা আর বিদ্বেষে রূপান্তরিত করে দিয়ে এসেছে। ও জীবনপাত করেও সে ঘৃণাকে আর ঘোচাতে পারবে না। তবু তারই উপর ওর যত লোভ।

এখন আর ওর চোখে জল পড়ে না। এখন সব জল শুকিয়ে জমাট বেঁধে একটা ক্লিষ্ট হাসিতে রূপান্তর লাভ করেছে কৃষ্ণপক্ষের শেষপাদের অস্তগামী চন্দ্রকলার পাণ্ডুর হাসির মত। সে এখন কথা বলে কম। সব সময় ঘাড় হেঁট করে থাকে। আপন মনে নিজের কাজ করে যায়। আগে যেমন আমাকে তার নিজের কথা বলাটা একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেটা বদলে গিয়েছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলে একটা-আধটা কথা ভাঙে। নিজের মনের যন্ত্রণার ও পিপাসার খবর যথাসম্ভব গোপন রাখে, ভাঙতে চায় না।

আমি আমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটাকে দেখে বুঝে ওর মনের কাছে যাবার একটা নতুন রাস্তা ধরলাম।

একদিন ওকে কাছে বসিয়ে একথা-সেকথার ছাঁদে বেঁধে ওকে এক

সময় বললাম—আচ্ছা ডেভিড, তুমি তো কই চিঠিপত্র লেখো না একেবারে।

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বললে—কাকে লিখব চিঠি? সংসারে আমার কে আছে?

বললাম, এ কথা বলছ কেন? তোমার মা আছেন, সুসান আছে, ডিকি আছে।

শেষ দুটো নাম উচ্চারণ করা অন্যায় হল জেনেও বললাম।

আমার কথা শুনে ডেভিডের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল।

প্রথমটায় ঠিক বুঝলাম না সেটা রাগে না অনুরাগে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আর আমার বুঝতে ভুল হল না যে এই আরক্তির মধ্যে অনুরাগের বাষ্পমাত্র নাই। সমস্তটাই রাগ, ক্রোধ আর বিদ্বেষ। দেখলাম তার স্বভাবনীল, উজ্জ্বল চোখ ক্রোধের রক্তাভায় লালচে এবং ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। অনুভব করলাম, এমনি এক ভিন্নতর উত্তেজনার মুহূর্তে সে একদিন এক অতি গর্হিত কাজ করে বসেছিল! সেদিন ছিল কামের তাড়না। আজ তার বদলে তাড়নাটা ক্রোধের।

আমি মনে মনে দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম—আর এই মুহূর্তে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কিনা! একবার ভাবলাম ওর ক্ষুব্ধ মুহূর্তে ওর বিদ্বিষ্ট ও ক্রুদ্ধ মনের সম্মুখীন হয়ে আমার কাজ কি! পরমুহূর্তে নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে গেলাম। ওর ক্রোধকে আমি ভয় করব? এই মন দিয়ে আমি ওকে সহানুভূতি দেখাচ্ছি এই এতদিন ধরে?

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হে, অত রাগ কার ওপর?

ভেবে অবাক হলাম—এই মানুষটি কিছুদিন আগে চোখের জল ফেলেছিল আর পৃথিবীতে তার কেউ নেই বলে! আজ চোখের জল, মনের বেদনা কেমন করে যেন বিদ্বেষের ও ক্রোধের বাষ্পে রূপান্তরিত হয়েছে! তার আহত, অপমানিত অহঙ্কার এই উত্তাপ জুগিয়েছে দিনে দিনে।

সে আরক্ত চোখ তুলে বললে—আপনি ছাড়া, তামাম দুনিয়ার ওপর! আজ আপনি বিশেষ করে যাদের নাম করলেন তাদেরই ওপর বেশী করে!

আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? তারা তোমার কি করেছে ডেভিড?

—করেনি? প্রায় গর্জন করে উঠল ডেভিড।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—কেন, তোমার মা—

—মা! কর্কশ স্বরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ডেভিড। আমার মা-ই তো স্যার, এই রাস্তায় আমাকে ঠেলে দিয়েছে! আমার যত ভালবাসা, যত সৎপ্রবৃত্তি সে তো আমার মা-ই আমার জীবনে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। বাবা যখন মারা গেল তখন সংসারে আমার আর কে ছিল স্যার? মা আমাকে নিয়ে, আমাকে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। আমাকে কুকুরের মত উপেক্ষা করে নিজের সুখের জন্যে আবার বিয়ে করে বসল! আর বিয়ে করে বসল একটা শয়তানকে। সেই শয়তানটা আমাকে, আমার মনটাকে, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে মায়েরই চোখের সামনে। মা কোনদিন একটা কথা বলেনি! সব দেখেছে! যদি মায়ের কাছে থাকতে পেতাম তাহলে তো আজ এখানে আসতে হত না!

বিচিত্র ক্রুদ্ধ যুক্তি! কিন্তু কি বলব?

ডেভিড তখন বিস্ফোরণ আরম্ভ করেছে। সে বলে চলল—কি বলব স্যার! আমার তো এখানে আপনার সামান্য সামান্য কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নাই। অবসর সময়ে নিজের জীবনটার কথা ভেবে দেখি! যখন ভাবি তখন রাগ ছাড়া আর তো কিছু হয় না! প্রথম রাগ হয় মায়ের ওপর, তারপর রাগ হয় ঐ শয়তানের বাচ্চা ডিকির ওপর। ওই শয়তানই তো আমাকে নরকে ঠেলে দিয়েছে এমন করে তিলে তিলে, ধীরে ধীরে আমাকে পাপের পথে নিয়ে গিয়েছে যে পাপকে পাপ বলে বুঝতে পারিনি! শেষকালে শয়তানটা ইচ্ছা করে আমার সমস্ত সুখ নষ্ট করবার ফন্দি করে জাল তৈরি করেছিল!

বুঝলাম আজ ও ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। আজ ওর কাছে আছে ও নিজে। আর আছে ওর মনের বিদ্বেষের বিষ! সেই বিষ নিজের অন্তরলোক থেকে নিজেই উদ্গীরণ করছে, করে সেই বিষ আবার নিজে পান করছে। আজ কোন যুক্তিই ওর হৃদয় স্পর্শ করবে না!

ও আবার সাপের মতন গর্জন করে উঠল—আর সেই শয়তানী! আমার অল্প বয়সের দোষে তাকে ভেবেছিলাম এঞ্জেল। আমারই ভুল। তাকে এঞ্জেল মনে করে মনে মনে তাকে পূজো করেছি। তার জন্যে কত চোখের জল ফেলেছি। তখন কি বুঝেছিলাম যে বেড়াল যেমন মারবার আগে ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, লেখাপড়া-জানা মেয়ে ভাল শিক্ষিত

অভিজাত স্বামী জোগাড় করার আগে আমাকে নিয়ে খানিকটা খেলা করছে! তবে হ্যাঁ, খেলা করার শখ তার মিটিয়ে দিয়েছি! আর খেলা করার ইচ্ছে হবে না তার কোনদিন। কিন্তু কি শয়তান! হাজার মানুষের সামনে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে কি না বললে আমাকে—ওকে অ্যারেস্ট কর! ও সাক্ষাৎ শয়তান! কোর্টে দাঁড়িয়েও মুখে একবার আটকাল না! সব বলে দিলে! আমাকে সাত বছর জেল দেবার জন্যেই তো বললে!

ক্রোধের বিষ একনাগাড়ে উদ্‌গিরণ করে নির্বীর্য সাপের মত হাঁপাতে লাগল ডেভিড!

আত্মপরতন্ত্রতায় আর ক্রোধের জ্বালায় উন্মাদ! আজ ও কোন কথাই শুনবে না!

তবু আমি জানি ওর প্রাণপুরুষ এই ক্রোধের ও আত্মপরতন্ত্রতার বিষবাষ্পের মধ্যে ওর হৃদয়-মন্দিরে বসে নীল হয়ে যাচ্ছেন মুহূর্তে মুহূর্তে। সেইজন্যই একদিন ও এই বিষকে নিজের মধ্যেই সংবরণ ও সংহরণ করবে। সেই বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হবে কিনা জানি না, তবে বিষের সাম্য একদিন ঘটবেই। আমার কথা সে দিনের জন্যে তোলা রইল।

ইতিমধ্যে আমি একটা কাজ করলাম।

ওকে না জানিয়েই করে ফেললাম কাজটা।

আমি ডিকির ঠিকানা জানতাম। জেনেছিলাম ডেভিডের কাছ থেকেই। ওর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে।

আমার জানা একজনকে লিখলাম ডিকি আর সুসানের খবর দেবার জন্যে। খবরটা গোপনে সংগ্রহ করবার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

খবর আসতে স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিন বিলম্ব হল।

ইতিমধ্যে ডেভিড আবার শান্ত হয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে ওকে ওর মা, কি সুসানের প্রসঙ্গ তুলে এটা-ওটা প্রশ্ন করেছি। ও সাধারণভাবে জবাব দিয়েছে।

তার থেকে আমি সঠিক কিছু বুঝতে পারিনি।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে প্রশ্নগুলো বোধহয় ও এড়িয়ে যেতে চায়।

আবার কখনও মনে হয়েছে ওর রাগ শান্ত হয়ে এসেছে।

এই সময় ডিকির আর সুসানের খবরটা এসে গেল আমার কাছে।

যে মোটরের কারখানায় ডিকি চাকরি করত সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত করা হয়েছে। বিতাড়নের কারণ—যদিও তার সাজা হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি—তবু সে একটা খারাপ এবং কুৎসিত অপরাধের মামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। তার বর্তমান সংবাদ পাওয়া যায়নি। আগে যে বাসায় থাকত সেখানেও সে আর থাকে না।

আর সুসানও কলকাতায় নেই বর্তমানে। এই অতি কুৎসিত ঘটনার পর সে কলকাতা থেকে চলে গিয়েছে তার বাবার সঙ্গে। এখন সে খুব সম্ভব আছে মুসৌরীতে। বিশ্বস্ত সূত্রে গোপনে জানা গিয়েছে তার বিবাহ আসন্ন সেখানে। এক মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে। বিয়ে হয়ে গেলে তার বাবা কলকাতায় ফিরে আসবেন।

খবরটা জেনে ভাবতে লাগলাম খবরটা ডেভিডকে বলব কি না!

অনেক ভেবে দেখলাম খবরটা ওকে না বলাই ভাল। কারণ ওর যে উত্তেজনা লক্ষ্য করেছিলাম তাতে ওকে জানালে ও আবার ক্ষুব্ধই হবে।

কিন্তু খবরটা শেষ পর্যন্ত ও-ই বলালে আমাকে।

একদিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, ডেভিড এসে কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল।

আমি বুঝলাম ওর কোন প্রয়োজন আছে আজ। আমার কাছে চাইবার কিছু থাকলে ও এমনি করে আমার কাছে কাছে ঘুরঘুর করে।

আমি হেসে বললাম—কি খবর ডেভিড?

একটু লজ্জিত হাসি হেসে বললে—একটা চিঠি লিখে দেবেন স্যার? আপনিই বলেছিলেন।

একটু অবাক হলাম! হেসে বললাম—তা বলেছিলাম বটে! কিন্তু কাকে লিখবে?

—ডিকিকে!

এবার আমি সুযোগ পেয়ে বললাম—ডিকির ওপর না তোমার রাগ, ওকে তুমি চিঠি লিখবে?

ডেভিড মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকল, বোধ হয় লজ্জা পেলে আমার কথায়। একটু হেসে বললে—আমারই দোষ স্যার। মিথ্যে মিথ্যে রাগ করেছিলাম সেদিন, রাগ করে কোন লাভ নাই—এ আমি ভাল করে বুঝেছি। কি হবে রাগ করে? ওদের আর কি দোষ? আমি ওদের জায়গায় থাকলে হয়তো এমনি করতাম।

—কি লিখবে ডিকিকে ? কোন্ ঠিকানায় লিখবে ?

—কেন, কারখানার ঠিকানায় ! এই সব কেমন আছে খবর জানবার জন্য !

আমি ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম—কিন্তু ডিকি তো কারখানায় আর চাকরি করে না !

অবাক হয়ে গেল ডেভিড। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি লক্ষ্য করলাম তার সেই আকস্মিক বিস্ময়ের দৃষ্টির মধ্য থেকেই আস্তে আস্তে একটা বিচিত্র বোধের অর্থ প্রকাশ পেলে। আমার কথার আসল অর্থ ও বুঝতে পেরেছে। ও বুঝতে পেরেছে আমি সব খবর আস্তে আস্তে সংগ্রহ করেছি। ও যা জানতে চায় আমি তা সব জানি। আর খবরগুলো যে ওরই জন্যে সংগ্রহ করেছি এটাও সে বুঝতে পেরেছে।

আমি ওকে প্রথমেই ডিকির খবর বললাম।

শুনে ও চুপ করে থাকল মাথা হেঁট করে।

তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে এক সময় বলে ফেললে—সুসানের খবর কিছু জানেন ?

—জানি। তুমি শুনবে ?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। তাকে আস্তে আস্তে যেটুকু জানতাম সবটুকু বললাম।

শুনে ও মাথা হেঁট করে মাটির পুতুলের মত বসে রইল। তারপর এক সময় আস্তে উঠে চলে গেল।

আমি বুঝলাম—এই মুহূর্তে সত্যি সত্যিই ওর মনের পৃথিবী লোকশূন্য হয়ে গিয়েছে ; ঘৃণা করবার জন্যেও একজনও মানুষ নেই !

নিরালম্ব বায়ুভূক অবস্থা !

কাকে এবং কি অবলম্বন করে এর পর সে বাঁচবে ? বিশ্বসংসারে কোন্ মানুষকে অবলম্বন করে তার জীবনের কল্পনা মঞ্জুরিত হবে ? হৃদয়বৃত্তির কোন্ প্রবৃত্তিই বা লীলায় প্রকাশিত হবে ?

আমি মাঝে মাঝে ওর বুকের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাই যেন ! সেখানে ও নিজে ছাড়া আর কিছুই নেই। আর সেই 'আমি'র লীলার জন্য ছোট ছেলের পুতুলের মত, মানুষ চাই, মানুষের স্মৃতি চাই, মানুষের

কল্পনা চাই—যে মানুষকে কল্পনায় ভালবাসবে অথবা ঘৃণা করবে, সমাদর করবে, অথবা নির্যাতন করবে। সব করবে নিজের ইচ্ছামত। নিজের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করবার জন্যেই ও ভালবাসবে, নিজের চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যেই ও অন্যকে নির্যাতন করবে। সংসারে অন্য মানুষেব ভাল-লাগার যে স্বতন্ত্র মূল্য আছে এখন তার কোন বোধই নেই যেন ওর জীবনে।

কিন্তু এইবার? মানুষ কই?

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি সব মানুষ ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

ও এক বিচিত্র শূন্যতার মধ্যে গিযে পড়েছে যে শূন্যতায শুধু ভয় আনে, আর আনে অসহায়তা। তবু অন্য দিকে ওর স্বার্থমগ্নতা আছে, ক্রোধ আছে, প্রেম আছে।

আর আছে মনুষ্যসম্পর্কহীন চিত্তের শূন্যলোকে আত্মমগ্নতার বিপুল-বিস্তার। অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ, অতি-ক্ষীণ, কম্পমান আলোক-বর্তিকার মত আছে অতি মৃদু, অতি গোপন, প্রায় অনুভূতিব-অগোচব এক বেদনা, যে বেদনা এই শূন্য, অন্ধকার অবস্থা পার হযে মানুষের স্মৃতি ও পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত জীবনে তাকে ফিরিযে আনতে ব্যগ্র। ধূপের অশরীবী গন্ধেব মত যে বেদনার শুধু অনুভব আছে, অথচ যার অস্তিত্ব নাই।

আমি বেশ কিছুদিন তাকে লক্ষ্য করে বেশ বিবেচনা সহকারে বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ভাবলাম—একে এই অবস্থা থেকে সবাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেক ভেবে একটা ঠিকও করলাম।

ছোট্ট একটি ছলনা।

অনেক ভেবেচিন্তে ওর মাকে একটি চিঠি লিখলাম।

লিখলাম—আমাকে আপনি চিনবেন না। তবে আমি আপনার ছেলের সহবন্দী। একসঙ্গেই জেলে আছি। আপনার ছেলে অভিমান করে আপনাকে চিঠি লেখে না, বলে—মা তার একটা খবর নিলে না! ও আপনাকে শেষ দেখেছিল সে-দিন ওর বিচারের রায় বেরিযে যাবার পরমূহুর্তে আপনি কোর্টে ফুঁপিযে কাঁদছিলেন! সেদিন ওর জন্যে আপনি ছাড়া আর কেউ কাঁদে নি। আজও নিশ্চয কাঁদে না। আপনি ওকে অবশ্য অবশ্য চিঠি লিখবেন। আপনার চিঠি পায়নি বলেই ও আপনাকে লিখতে পারছে না লজ্জায়। আপনি ওকে যখন চিঠি লিখবেন তখন আমার এ চিঠির কোন উল্লেখ করবেন না দয়া করে!

চিঠিখানি ওর অগোচরে রওনা করে দিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় মাসখানেক পর!

ডেভিডের ডাক পড়ল জেল-অফিসে।

ওর অবস্থা এমনিই হয়েছে যে ওর ভয়টা আর পাঁচজনের চেয়ে বেশী। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। দেখে ওকে সাহস দিয়ে বললাম—ভয় কিসের? তুমি কোনও অন্যায় করনি! ভয়ের কিছুই নেই! যাও, চলে যাও।

সাহস পেয়ে বাধ্য হয়ে মুখে হাসি মেখে যেতে হল তাকে।

কিন্তু ফিরে এলে মুখে সত্যিকারের আনন্দের আলো দেখতে পেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ডেভিড, এত খুশি কিসের?

একমুখ হেসে সে বললে—মা চিঠি লিখেছে স্যার!

আমি বিস্মিত হয়ে সানন্দ কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—তাই না কি?

সে কি খুশি ডেভিডের! হাসিমুখে আমার দিকে খামখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—পড়ুন! মা লিখেছে! আর লিখেছে সেই শয়তানের বাচ্চা।

কিন্তু আজ অবাক হয়ে দেখলাম—শয়তানের বাচ্চার স্মরণে আগে যেমন বিষাক্ত দেখেছিলাম এবার সে বিষের বদলে যেন কৌতুক রয়েছে অনেকখানি!

বড় ভাল লাগল।

খামের মধ্যে থেকে চিঠি বের করে পড়তে আরম্ভ করলাম। ওর মা লিখেছেন।

কত আদর করে লিখেছেন ওর মা! তিনি এই কটা বছর ওর কথা ভেবে প্রতিদিন চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু চিঠি লিখতে ভরসা পান নি। আজ কত দিন তো ডেভিড কোন সম্পর্কই রাখে না তাঁর সঙ্গে। আজ আর তিনি থাকতে পারলেন না। তাকে চিঠি লিখতে বসেছেন। এই সঙ্গে তার একটি পিতৃহীন সৎ-ভাইও চিঠি লিখছে। তার নাম ভিক্টর, বয়স বছর সাত-আট। ডেভিড যেন চিঠির জবাব দেয়। দেরি না করে।

চিঠিখানা পড়ে আমি হেসে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ও জিজ্ঞাসা করলে, একটু কৌতুকের সঙ্গেই প্রশ্ন করলে—শয়তানের বাচ্চার চিঠিটা পড়লেন?

ওর কৌতুক অনুভব করে হেসে বললাম—না, পড়িনি, পড়ছি।

পড়তে লাগলাম ওর ভায়ের চিঠি। সে লিখেছে—তুমি আমাকে দেখোনি, আমিও তোমাকে দেখিনি। কিন্তু মায়ের কাছে প্রতিদিন তোমার নাম শুনি। মা বলে—কজন বদমাইশ লোক বজ্জাতি করে তোমাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে মিছামিছি। আমি বড় হয়ে তাদের মারব।

তারপর আরও অনেক আজেবাজে কথা। যার মধ্যে আন্তরিক স্নেহের আর্তি সুপরিস্ফুট।

আমি চিঠিখানি পড়ে, ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে ওর হাতে ফেরত দিলাম। বললাম—চিঠির জবাব দাও মাকে-ভাইকে। ওদের আসতে লেখ। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে বল।

সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠল ডেভিড। বললে—আমি কেন লিখব স্যার? মায়ের যদি ইচ্ছা হয় তবে নিজে থেকে আসবে দেখা করতে! তাকে বলতে যাব কেন?

সত্যি কথাই তো! ডেভিডের কি অভিমান নাই? আমি হাসলাম।

সুতরাং ব্যবস্থাটা আবার আমাকেই করতে হয়। ওর মাকে একটু তিরস্কার করেই লিখলাম। মনে পড়িয়ে দিলাম—চিঠি লিখবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলের সঙ্গে এসে দেখা করা উচিত ছিল। তিনি যেন ছেলের সঙ্গে এসে অবিলম্বে দেখা করেন।

আবার একদিন ডাক পড়ল ডেভিডের জেলের অফিসে। যখন ফিরে এল তখন তার মুখে হাসি, চোখে জল। আমার দিকে তাকিয়ে মুখের হাসিটি বিস্তৃততর করে, চোখের জল চোখ থেকে সরিয়ে সে আমাকে জানালে—মা আর ভাই এসেছিল দেখা করতে।

তারপর হাসিমুখে হাতের কাগজের বাক্সটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—কি?

—মা আমার জন্যে নিজে বাড়িতে কেক তৈরী করে নিয়ে এসেছিল!

তার মুখের হাসি দেখে মনে হল, সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে যা মহার্ঘ ও দুর্লভ তাই আজ সে নিজের হাতে পেয়ে গিয়েছে ঐ কাগজের বাক্সের চেহারায়!

হাসলাম।

—খান। বলে বাক্সটি খুলে ধরলে ডেভিড।—না, না, একটা 'পিস' নয়, আরও নিন।

ছুহাতে দু পিস কেক নিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম।

নিজে সে এক 'পিস' নিয়ে বাকীটা আবার বাক্সের উপর রেখে দিলে দুর্লভ সঞ্চয়ের মত।

বুঝলাম, ডেভিড আবার জীবনে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। যে আশ্রয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে তার ভবিষ্যৎ আবার মুকুলিত হয়ে উঠবার জন্যে নূতন মঞ্জরী মেলছে।

তারপর আমার কাজের অবসরে সে আবার আমার কাছে এসে বসে।

চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি ছেলেটা দিনে দিনে কত বদলে যাচ্ছে। বদলাবার জন্যে অনেক দাম দিয়েছে ও। বহু দুঃখ আর ক্লেশের দাম। ও অনেক ভেবেছে, অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে, হয়তো বা অনেক কেঁদেওছে একা একা। তারই ফলে অনেক বুঝেছে, অনেক সয়েছে, অনেক কিছু মেনে নিয়েছে। ও বুঝেছে সংসারে ও নিজে ছাড়াও অন্য মানুষ আছে। তাদের ইচ্ছার, তাদের রুচি-অরুচির প্রশ্ন ওর জীবনে, ওর নিজের রুচি-অরুচির প্রশ্নের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। ও বুঝেছে সংসারে অনেক সইতে হয়, অনেক মেনে নিতে হয়। ও বুঝেছে অনেক অসম্ভব আছে সংসারে যা-পাওয়া যায় না। ও বুঝেছে অসম্ভবের জন্য মাথা ঠুকে লাভ নাই।

ওর এই তিল তিল ক্লেশকর অভিজ্ঞতার চিহ্ন ওর মুখে, ওর চোখে, ওর বাক্যে, ওর ব্যবহারে, ওর চলায় একটা অতি স্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে। অন্য কেউ না বুঝলেও, এই দীর্ঘ দিনের সাহচর্যে আমি সেটা ঠিক বুঝতে পারি। আমি দেখতে পাচ্ছি একটা দীর্ঘ ক্লেশকর যাত্রা প্রায় সমাপ্ত করে এক শ্যামল, স্নিগ্ধ জীবনের উপান্তে এসে পৌঁছেছে ডেভিড।

আমি আজকাল ওকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি—জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে ডেভিড?

ডেভিড আমার মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে—এখন থেকে ভেবে কি করব?

—কেন? এ কি বলছ? বেরুতে আর কত দেরি?

বিষণ্ণ হাসি হেসে ডেভিড বলে—এখনও তিন বছর স্যার!

আমি হেসে বলি—তিন বছর আর কদিন? দেখতে দেখতে কেটে যাবে! তারপর?

ও হেসে বলে—বেরিয়ে যা হয় কিছু করব!

আমি জানি, সঠিক জানি, এ ডেভিডের নম্রতা, বিষণ্ণতা নয়। প্রসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যয় যে তার জীবনে ফিরে এসেছে তা জানি। আমি হেসে বলি—জেল থেকে বেরিয়ে কি যেন করবে তুমি বলেছিলে সেদিন?

এবার ডেভিড বললে—আমাকে কে চাকরি দেবে স্যার? তবে হ্যাঁ, নিশ্চয় কিছু করব! কিছু না পারি কুলির কাজ করব। মা আছে, ভাই আছে, তাদের তো খাওয়াতে হবে!

আমি হেসে বললাম—আমি যদি তোমার আগে বেরিয়ে যাই তুমি জেল থেকে বেরিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো! আমি তোমার চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।

আরও কিছু দিন পর।

আকস্মিকভাবে কর্তৃপক্ষ আমাকে খালাস দিলেন।

আগের দিন সন্ধ্যার সময় জেলার মিঃ সরকার আমাকে খবর দিলেন।

মিঃ সরকার চলে গেলে ডেভিডকে ডাকলাম, বললাম—ডেভিড, আমার জিনিসপত্রগুলি একটু গুছিয়ে দাও। এখুনি।

—কেন স্যার? অবাক হয়ে গেল ডেভিড।

তার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললাম—আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি ডেভিড।

ডেভিড পাথরের মূর্তির মত আবছা অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ও জানত ঠিকই, ওর আর আমার একদিন ছাড়াছাড়ি হবেই। কিন্তু সেই জানাটা যেন হৃদয়ে তার প্রবেশ করে নাই।

আমি আমার হাতখানা দিয়ে তার ঘাড়ে চাপ দিয়ে বললাম—কি, মন খারাপ লাগছে?

একটু চুপ করে থেকে বললে, একটু হেসেই বললে—তা একটু লাগছে বৈ কি!

—লাগছে? লাগারই কথা! তবে ভয় পেয়ো না, কি মন খারাপ ক'রো না!

—না স্যার!

—জেল থেকে বেরিয়েই আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। আর মধ্যে মাঝে চিঠি লিখো। আমি বরং মাঝে মাঝে তোমার মায়ের খোঁজ-খবর করব। তুমি কিছু ভেবো না।

পরদিন ভোরে যখন জেল থেকে বেরিয়ে গেলাম আঁর তার সঙ্গে দেখা হল না। তবু মনে মনে কল্পনা করলাম, কল্পনা করতে ভাল লাগল, আকাশের অন্ধকার কেটে আবছা আলো ফুটবার আগেই সে জেগে উঠেছে, বিছানায় শুযে শুয়ে আমার জেল ত্যাগ করে যাওযার ছবিটি কল্পনা করছে নিজের মনে মনে।

আমি জানি আজকের নূতন প্রভাতে যখন ও আবার কোন নূতন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে তখন সে কর্মকে দেখে ও ভয় পাবে না। আমাকে বাদ দিযে কারা-জীবনের নূতন দিনের মধ্যে হযতো বেদনার স্পর্শ থাকবে, কিন্তু সাহসের অথবা সহনশীলতার আর অভাব ঘটবে না।

প্রায় আড়াই বছর পর।

একদিন সকাল বেলা কাজে বেরুব বলে তৈরী হচ্ছি এমন সময় চাকব এসে খবর দিলে, একটি সাযেব দেখা করতে এসেছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—এখন কাজে বেরিযে যাচ্ছি। এখন কি করে দেখা করব? তুমি বলনি?

চাকর বললে—বলেছিলাম। সাযেব বললে, আমার বেশী সময় লাগবে না। এক মিনিট দেখা করেই চলে যাব!

বিরক্ত হয়েই বেরিযে গেলাম।

—কি চাই? বলতে বলতেই দেখলাম—সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড।

—ডেভিড!

এক মুখ হেসে এগিয়ে এল সে।

—ভাল আছ ডেভিড? কবে বেরিযে এলে?

—দিন সাতেক হল স্যার!

—সাত দিন এসেছ, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করনি!

—একটা চাকরি-বাকরি না পেয়ে আপনার কাছে আসতে ইচ্ছে করছিল না স্যার!

—চাকরি পেয়েছ? মাইনে কত?

—বেশী নয় স্যার। সব সমেত একশো পঁচিশ টাকার মত।

—তাই তো হে, মাইনে যে বড্ড কম! তা কোথায় কাজ করছ?

—যেখানে কাজ করতাম সেইখানেই।

অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাকে তারা আবার নিলে?

—হ্যাঁ স্যার, নিল। মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম। মালিক খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে বললে—আচ্ছা, কাজ কর। মাইনে কিন্তু সব সমেত একশো পঁচিশ পাবে।

—সে কি হে? এইরকমভাবে ঠকানো?

—তা খানিকটা ঠকিয়েছে স্যার। তা সুযোগ পেলে তো ঠকাবেই। তবে একটা কথা, আমি তো স্যার, সাত বছর কাজ করি নি! কাজকর্ম ভুলে গিয়েছি সব। আবার তো নতুন করে সব শিখতে হবে।

কথাটা খানিকটা সত্য। আমি ভাবিনি। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি তোমার জন্যে একটা চাকরি দেখব?

ডেভিড বললে—এখন কিছু দিন যাক স্যার। আমি আমার পুরানো হাতটা আবার তৈরী করে নিই। তখন এখানে মালিককে বলব মাইনে বাড়াবার কথা। না হলে আপনাকে বলব। এখন যদি আপনি চাকরি করে দেন তাহলে আমিও কাজ তুলতে পারব না, তাতে আমার উপরে মালিক রাগ করবে। আপনারও বদনাম হবে।

ডেভিডের কথা মেনে নিতে হল। বললাম—তারপর? আর সব ভাল? মা, ভাই?

—সব ভাল। আপনি মায়ের খোঁজ করেছিলেন, আমার ভাই ভিক্টরের কাছে শুনলাম। মা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আর একটা কথা স্যার—

আমার মনে হল ডেভিড যেন সঙ্কোচে থেমে গেল কি বলতে গিয়ে। আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম—বল, কি বলছিলে?

সঙ্কোচের সঙ্গে ডেভিড বললে—মা বলেছিলেন—আপনি যদি কাল সন্ধ্যেতে ডিনার খান আমাদের বাড়িতে মা খুব খুশী হবেন!

আমি তার সঙ্কোচ কাটিয়ে দেবার চেষ্টায় সোৎসাহে বললাম—নিশ্চয়, এ তো আনন্দের কথা। আনন্দের সঙ্গে যাব।

কৃতার্থ হয়ে গেল ডেভিড। হাসিমুখে হাত কচলাতে কচলাতে বললে—আমি তাহলে সাতটায় সময় আসব স্যার!

—তোমাকে আসতে হবে কেন? আমি তো তোমার বাড়ি চিনি।

ছোট ছেলের মত ঝোঁক দিয়ে ডেভিড বলল—না স্যার, আমি আসব আপনাকে নিতে।

হেসে বললাম—আচ্ছা!

পরদিন সন্ধ্যায় সাতটার খানিকটা আগেই ডেভিড এসে হাজির হল। এসেছে ট্যাক্সি নিয়ে।

আমি বললাম—ট্যাক্সি নিয়ে এসেছ কেন? ট্যাক্সি ছেড়ে দাও।

একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম হয়তো; ডেভিড ভড়কে গেল। বললে—আপনার কষ্ট হবে। সেই জন্যে।

—আমার কিছু কষ্ট হবে না। তুমি আগে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে এস।

আমরা ট্রামে রওনা হলাম। ট্রাম থেকে নেমে সায়েবপাড়ার নির্জন রাস্তা দিয়ে দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলাম। সেই পার্কটা, তারপর বাঁক ফিরে সেই নির্জন তরুবীথি। ডেভিডকে পাশে নিয়ে চলতে চলতে পুরানো ডেভিডের কথা মনে পড়ে এই পটভূমি তার এক প্রিয় সঙ্গিনীর ছবি আমার মনে ফুটিয়ে তুললে। আমার কৌতূহল হল জানতে—ডেভিডের মনেও কি সেই ছবি ফুটে উঠেছে এই মুহূর্তে?

আমি ডাকলাম—ডেভিড!

—স্যার।

—কি ভাবছ ডেভিড? বয়স্যের মত, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই প্রশ্ন করলাম।

ডেভিড হেসে বললে—কিছু না স্যার। একটু তাড়াতাড়ি চলুন। প্রায় আটটা বাজে!

বুঝলাম সেই স্মৃতি ডেভিডের মনেও ভেসে উঠেছে, ও তাড়াতাড়ি সরে যেতে চায় সে স্মৃতির সান্নিধ্য থেকে।

ডেভিডের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

দরজায় কড়া নাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ডেভিডের মা আর ভিক্টর এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে আমাকে 'রিসিভ' করার জন্যে।

ভিক্‌টরকে আমি চিনতাম। তাকে হাসিমুখে বললাম—হ্যালো ভিক্‌টর, হাউ ডু ইউ ডু?

খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

ভাঙা সস্তা টেবিল, দরিদ্রের আয়োজন, তবু কি সুন্দর! ভাঙা টেবিলের উপর সাদা চাদর পড়েছে। তার মাঝখানে একটি কাঁচের ফ্লাওয়ার ভাসে এক গোছা রঙীন মরসুমী ফুল এক আশ্চর্য উৎসব শোভার স্পর্শ এনেছে। ঘরের ঝুল ঝাড়া হয়েছে। একটি জোর পাওয়ারের উজ্জ্বল আলোয় ঘরখানি ঝলমল করছে।

দরজার পাশে দু দিকে দেওয়ালে দুই ছবি। আকারে ছোট তবু বুঝলাম ম্যাডোনার ছবি, দুখানিই র‍্যাফায়েলের আঁকা। একটিতে মানবপুত্র মায়ের কোলে বসে আছেন, অন্যটিতে মায়েব হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ডেভিড বললে—ম্যাডোনার ছবি।

তার মা বললেন—ডেভিড যখন ছিল না, তখন ডেভিডের বই থেকে কেটে ভিকটর বাঁধিয়েছিল। আমি ওকে মেরেছিলাম তাব জন্যে।

ডেভিড হেসে বললে—অন্যায করেছিলে। ভিক্‌টর ঠিক করেছিল।

তারপর আমার দিকে ফিরে ডেভিড বললে—ফাদার নর্টন বইখানা দিয়েছিলেন আমাকে।

ডেভিডের মা বললে—উপহারের জিনিস নষ্ট করার জন্যেই আমি ওকে মেরেছিলাম!

তাকালাম ডেভিডের মায়ের দিকে।

এক সময় মোটামুটি সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী ছিলেন ভদ্রমহিলা। এখন সংসারের নানান দুঃখের ও ক্লেশের যন্ত্রণায় যৌবন ও স্বাস্থ্য অকালে অন্তর্হিত হয়েছে। রগের কাছে চুলে সাদা ছোপ ধরেছে, রগের নীচেই গালের উপর হাড় ঠেলে উঠেছে উঁচু হয়ে, চোখের কোল ফোলা-ফোলা, সর্বত্র বয়সের ও ক্লেশের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু তারই মধ্যে চোখের তারায় নম্র শান্ত দৃষ্টি, যাতে আমার মনে হল তিনি সব ক্লেশ নম্রভাবে শান্তভাবে সহ্য করেছেন। দু পাশে মানব-পুত্রের জননীব আশ্চর্য লাবণ্যময় দুই মূর্তির মাঝখানে এই লাবণ্যহীন, দুঃখতাপদগ্ধ জননীর মুখের ম্লান নম্র হাসিমাখা মুখখানি সমান মহিমায় মহিমান্বিত বলে মনে হল আমার কাছে।